ভারতবর্ষ

অনিল ঘড়াই

পত্রলেখা

৯/৩, টেমার লেন

কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

বাবা ও মাকে

সূচিপত্র

অনিল ঘড়াই

অনিল ঘড়াই

হাত

খল্‌সে মাছের আঁশের চেয়েও ক্ষিদেয় চকচক করত ভুটারীর সহজ সরল নিষ্পাপ চোখের তারা, খাবার দেখলেই লুলিয়ে উঠত জিহ্বা—মোচড়-মারা ক্ষিদেটা এক আশ্চর্য বিষণ্ণতায় শ্লথ করে দিত তার হাঁটা-চলা। পেটে ক্ষিদে নিয়ে হাঁটা মানে ন'মাসের গর্ভ নিয়ে হাঁটা। ভুটারী আকাশ দেখত, আকুল চোখে পথ দেখত, মাথুরকে দেখতে না পেলে শূন্য পেটে ঢুকিয়ে নিত হাওয়া। তখনই লোহার পাত কাঁপিয়ে ট্রেন যেত ঝমঝমিয়ে, তার ঝুপড়ি ঘরটা দুলে উঠত ভূমিকম্পের মতো, ভুটারী তখন ক্ষুৎকাতর দৃষ্টি মেলে দেখত, মেল ট্রেনটা চলে গিয়েছে—রেল লাইনের ধারে ধু-ধু, শূন্য হাওয়া। বাইরে এসে দাঁড়ালে তার চোখ আতিপাতি করে খুঁজত কলার খোসা, বাবুদের ফেলে দেওয়া ঠোঙ্গায় মোড়ান বাসি খাবার। কোনো দিন পেত, কোনো দিন আবার ফক্কা। তবু সে গুলাপের হাত ধরে যাঞ্চা চোখের দৃষ্টি মেলে চলে যেত স্টেশন পর্যন্ত। কিছু না কিছু পেয়ে যেতই—ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে জুটে যেত হলুদ ছাতা ধরা আস্ত একটা পাউরুটি।

গুলাপ তার চার-সাড়ে চার বছরের ছেলে, কথা বলে তোতাপাখির মতন। তার কথা এত আধো আধো, মিষ্টি মিষ্টি, নরম নরম—ভুটারী ক্ষিদে ভুলে সেই ছেলের কথা হাঁ করে শুনত। গুলাপ বলত—মারে, ভোখ লাগে—দে না কিছু খাবার। সেই কখুন থিকে কিছু খাই নি, পেটের ভেতর হড়হড় করে ডাকচে। ভুটারী শুনত—গুলাপের ছোট্ট পেটে চাপা মেঘ ডাকার মতো গুড়গুড় একটা আওয়াজ, ক্ষিদে লাগলে পেটও যে খরায় ঝলসানো আকাশের মতো কুঁকড়ে ওঠে, কৃমিজল কাটে, রাগে গরগর করে, এটা সে তখন হাড়ে হাড়ে টের পেত।

গাঁ খানা অনেক দূরে, স্টেশন মাইল খানেকের পথ। রেল লাইনের ধারে গজিয়ে ওঠা পাঁচ সাতটা ঝুপড়িতে তাদের মতো হাভাতে লোকের বসবাস। স্টেশনের ধারে পাত্তা পায় নি, যতবার ঝুপড়ি বেঁধেছে মাথুর—ততবারই খাকি পোষাকের হাবিলদার ভেঙ্গে দিয়েছে ঘর। তা ছাড়া, রাত বেরাতে চড়াও হোত স্টেশন এলাকার মাতাল, মা-বোনের ইজ্জত তখন ধুলোয় মিশে যাবার যোগাড়। দেখে শুনে মাথুরের সাথে আরও ছ'জন উঠে এল—রাতারাতি রেল লাইনের ধারে, গড়ে উঠল একটা পাড়া—খেটে খাওয়া মানুষগুলোই ঝুপড়ি-ঘর থেকে ভিজে ভাত বেঁধে নিয়ে খাটতে যেত আশে-পাশের গাঁ গুলোয়। ছোট স্টেশন, মেল ট্রেন দাঁড়ায় না। স্পর্ধিত ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। ভুটারী কত

দিন দেখেছে—সেই ক্ষিপ্ত ধূলিকণা চোখে ঢুকলে হুড় হুড় করে জল বেরয়, চোখের সাদা জমিন লাল হয়ে যায় সিঁদুরে মেঘের মতন। মাথুর রাগ করে বলে, যাবি নে ওখানে। ওটা হল গিয়ে বাবুদের জায়গা। এই ছেঁড়াখুঁড়ো শাড়িতে তুই ইস্টিশানে যাস, তোর লাজ লাগে না?

ভুটারীর লাজ-লজ্জা চোখের কোণ থেকে ধুয়ে মুছে সাফ, তবু সে ভিখিরি গুলোর মতো হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে, 'এ বাবু দুটো খেতে দে না'—বলে চেঁচাতে পারে না। কোথায় যেন বাজে, কোথায় যেন খচখচ করে কাঁটা—তখন সে মুখ নামিয়ে ঘাসফুল দেখতে দেখতে ওদলা গায়ে বাতাস লাগিয়ে ফিরে আসে ঘরে।

—হোটেল বাবুর কাছে যাবি? অবলা ডাকতে এলেও সে যায় না, ঝুপড়ি ঘরের ঝাঁপ লাগিয়ে গুলাপকে বুকের দুধ ধরিয়ে দিয়ে কাঁদে, গুলাপ চুষে চুষে খায় তাকে—আর সে দিনকে দিন বাঁশগাছের চেয়েও রোগা হয়ে যায়।

মাথুর গিয়েছে কাজে, সাত গাঁ পেরিয়ে নদীর ধারের গাঁটায়—সেখানে নাকি অনেক কাজ, অথচ কাজের লোকের অভাব! যে মানুষটা তাকে নিয়ে গেল—সেই মানুষটাই যাওয়ার সময় বিশটা টাকা দিয়ে গেল ঘর খরচের জন্য। আঁচলের খুঁটে টাকাটা বেঁধে ভুটারীর মনে হয়েছিল—এমন মানুষই দেবতা। এমন মানুষই হল বন পালানো হাওয়া, যা বেঁচে থাকার জন্য এই খরার মরশুমে ভীষণ প্রয়োজন। মাথুর চলে গেল লুঙ্গি, কাস্তে আর নিড়ুনি নিয়ে। যাওয়ার সময় সে ভুটারীর হাত ধরে বলল, মন খারাপ করবি নে, সময় পেলে আমি আসব। এসে খাই-খরচ আর বাজার-হাট করে দিয়ে যাব। সে আরো বলল, আমি যে দেশে যাচ্ছি—সেখানে মনপছন্দ চুড়ি পাওয়া যায়। তোর হাতের এট্টা রুলি খুলে দে, আসার সময় গুচ্ছের চুড়ি কিনে আনব। তোর অত সোন্দর হাত, ফাঁকা থাকলে আমার একদম ভাল লাগে না! দে, ঐ ফাটা চুড়িটাই খুলে দে। মাপ না থাকলে মেয়েছেলের জিনিস কেনা বড় ঝামেলার। সোহাগের কথা শুনে চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়েছিল ভুটারীর, গা কাঁটা দিয়ে উঠেছিল তৎক্ষণাৎ, ঐ দুপুর বেলায় ভুটারী তার সব দিল, সেই সঙ্গে ঐ ভাঙ্গা চুড়িটা। এখন প্রায় শূন্য হাতে প্লাস্টিকের শাঁখা, তার খাঁজে খাঁজে কাঁড়কুষ্টি ময়লা, গা ধোওয়ার সময় বুড়ো আঙুলে ডলা দিলেও ওঠে না, ছিনে জোঁকের মতো বসে থাকে। ভুস করে পানকৌড়ি পাখির মতো ডুব মেরে, তন্বী শরীরের জল ঝেড়ে অবলা বলে—চ, আজ তোকে নতুন শাঁখা পরিয়ে আনি। তোর অত সোন্দর তরলাবাঁশের মতো হাত, কাজ করা শাঁখা পরলে ভেষণ মানাবে। ভুটারী নিজেও জানে—হরিণের যেমন শিং সুন্দর, তার হাত দুটো তার চেয়েও সুন্দর। এমন গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট, নরম কলা [illegible] মতো

হাতে দামী শাঁখা কেন, একটা লাল সুতো বেঁধে রাখলেও দারুণ মানায়। মাথুরও ঐ হাত দুটোর জন্য পাগল, ছেলেমানুষী করে ঘাম বুকের কাছে হাতটা ঠুসে ধরে বলে, ভুটারী রে, তোর এই হাত দুটা লক্ষ্মীর হাত। এমন তুলো নরম, পদ্ম ঘেরাণ হাত এই আকাট চাষার কপালে জুটবে—তা আমি সপনেও ভাবি নি। সেই হাত—যে হাত ধরে তার ঘরের মানুষটা আবেগ জ্বরে থরো থরো, সেই তুলো নরম, পদ্ম গন্ধ হাত এখন খুঁজে বেড়ায় ট্রেন থেকে ছুঁড়ে দেওয়া কলার খোসা, বাসি পাউরুটি, ঠোঙ্গার কোণে লেগে থাকা উচ্ছিষ্ট খাবার! গুলাপ রাত দিন খাওয়ার জন্য ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে কাঁদে। শুধোয়—এ মা, বাপ কবে আসবে রে? তার জন্যি আমার কান্না পায়। গুলাপের কেন, ভুটারীরও কান্না পায়। বিশটা টাকায় বিশ দিনও চলে না, তবু এটা সেটা দিয়ে পাক্কা তিরিশ দিন চালিয়ে দিয়েছে ভুটারী, এখনও মাথুরের কোনো দেখা নেই। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চলে যায়, কত লোক হেঁটে যায় গ্রামের পথে—ভুটারী হাপুস নয়নে চেয়ে থাকে। তার শূন্য দৃষ্টিতে সেই চেনা শররীরটা ঢোলকলমী ডালের মতো দুলে ওঠে না। মাথুর তো একা যায় নি, তার সাথে গিয়েছে আরো ন'জন। অবলার বর কাঙ্গালীও গিয়েছে মাথুরের সাথে—কিন্তু অবলা কোনো দিন পথ দেখে না, দুশ্চিন্তায় কাতরে ওঠে না। ভুটারীর মন খারাপ দেখলে সে ঠাট্টা করে বলে, এই পোড়ার সন্সারে পুরুষ মানুষ কোনো দিন পোড়ে না—যত পোড়ে এই অবলা শরীল। তুই এত ভাবিস কেনে? নিজেকে সল্তের মতো পাকিয়ে নিয়ে জ্বলে ওঠ, তাহলে মনের আঁধার ঘুচে যাবে, তোর এত 'নেই নেই' স্বভাবটা আর থাকবে না। আমি তো কৎদিন তোকে বলেচি হোটেলওলা ভাল লোক, তুই যদি না যাস, কেউ কি তোর দুয়ার উপচে আসবে? সেদিন নেই রে দিদি, সেদিনের মুখে আঁখার ছাই।

—তুই এখন যা তো। অবলাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে ভুটারী, ঘেন্নায় সে তখন একটা জড়সড়ো কেন্নো। তার ময়লা-ধরা শাঁখায় যে পবিত্রতা আছে—তা যেন অবলার কারুকাজ করা শাঁখা থেকে উধাও। অথচ, বড় করে কপালে সিঁদুরের টিপ পরে অবলা, সিঁথিতে দেয় টকটকে সিঁদুর, আর ভুটারী তখন ভীতু ইঁদুরের মতো ঘরের কোণে গুলাপকে বুকের তাপ দিয়ে ফোঁপায়। তার সিঁদুর ডিবা ফাঁকা, সিঁথির দু পাশে ফুঁপো চুলগুলো তেল বিনা কেঁসোর মতো দেখায়। যে হাত দুটো মাথুরের কাছে লক্ষ্মীর হাত, যে হাত মাথুরকে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখাতো, সেই পবিত্র হাত দিয়ে সে অন্য কাউকে [illegible] ছোঁয়ায় সন্তুষ্ট করতে পারবে না—তাতে তার খিদের জ্বালায় জীবন যদি বেরিয়ে যায় তো যাক।

পরপর দু দিন মুষলধারে বৃষ্টি [illegible], আর খরায় পোড়া ধরিত্রী আদুল

গায়ে সপসপে ভিজে হাই তুলল আরামের। বিল মাঠে গুগলি তুলতে গিয়ে ভুটারী আর গুলাপ অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরে এল। সেই রাত থেকে গুলাপের খুব জ্বর, আর ভুটারী নিজেও শরীরে অসহনীয় তাপ নিয়ে বিছানা নিল। যার কেউ নেই তার বুঝি ভগবান আছে। বিনা ওষুধে বিনা পথ্যে দিন দুয়ের মধ্যেই ঝরঝরে হয়ে উঠল গুলাপ, কিন্তু তার জ্বরো শরীরটা তখন ক্ষিদের জন্য হাঁক পাকায়, কাউকে খেতে দেখলে সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, তার ছোট্ট লাল টুসটুসে জিভটা ভিজে ওঠে লোভের লালায়। ভুটারী তাকে বকতে ঝকতে পারে না। শুধু ঘরে ডেকে এনে বোঝায়। বোঝালেও কথা শোনে না গুলাপ। ক্ষিদের জন্য শোল পোনার মতো চড়বড়িয়ে কাঁদে—এ মা, মা রে—তুই আমাকে খুদ ভেজে দে।

চালের হাঁড়ি শূন্য রাখতে নেই, এক মুঠো চাল মাটির হাঁড়ির কোণে পড়েছিল। তাই কুড়িয়ে কাড়িয়ে কড়াই চাপিয়ে ভেজে দেয় ভুটারী। গুলাপ কুড় মুড় করে খায়, তার লাল জিভে ময়লার মতো আটকে যায় চাল ভাজা, ভর পেট জল খেয়ে সে চলে যায় ঘুরতে। ফিরে আসে দুপুর পার করে, তার হাতে তখন একটা পাউরুটি। দেখে—জিভে জল আসে ভুটারীর, ঢোক গিলে শুধায়, কুথায় পেলি রে বাপ? অখন তো মেল টেরেন যায় নি?

গুলাপ দেবশিশুর মতো হাসে, অবলা মাসী দিয়েচে—বলেই খুলে ফেলে কাগজের মোড়ক, অর্দ্ধেকটা এগিয়ে দেয় ভুটারীর দিকে—খা মা, খা। দেখ, কেমুন ঘেরাণ! আঃ! রুটিটা ধরে নিয়েই রেল লাইনের দিকে চরম ঘেন্নায় ছুঁড়ে দেয় ভুটারী, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ফেলে দে, ফেলে দে বলচি। ঐ পাপের রুটি তুই খাবি নে। তোর বাপ আসলে—আমি তোকে রুটি কিনে দিব।

বুকের কাছে রুটি চেপে গুলাপ ভীতু খরগোশ ছানার মতো তাকায়, ফেলব না। এত সোন্দর রুটি ফেলব কেনে?

—তবে রে! অসুস্থ শরীর নিয়ে ভুটারী তেড়ে যায়, জোর করে রুটিটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় রেল লাইনের দিকে—তারপর, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ও রুটি খেতে নেই বাপ, ও রুটিতে পোকা আছে।

গুলাপ কিছু বুঝতে পারে না, তার লোভী দৃষ্টি ছোট হয়ে আসে ভয়ে, শুকনো ঢোক গিলে সে কাচুমাচু মুখে বলে, মা রে, ভোখ লেগেচে। কাঁপা দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকের কাছে সস্নেহে টেনে আনে ভুটারী, তারপর বুকের কাপড় সরিয়ে ওদ্‌লা করে দেয় স্তন—খা, সোনা আমার খা। মানিক আমার খা⋯তুই আমাকে খেয়ে বেঁচে থাক।

যে মেঘটা দু দিন আগে বৃষ্টি দিয়ে নিরুদ্দেশ হল সেই মহিষবর্ণ মেঘ ফিরে

এল আকাশে ভয়াল ভীষণ ছায়া ফেলে। মেঘের গোমড়া মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠেছিল ভুটারী, ভেবেছিল এতদিন অতিক্রান্ত হল, তবু ঘরের মানুষটা কেন ফিরছে না। এদিকে জীবন ধারণের জন্য ভাতের বড় আকাল, স্টেশন চত্বরে মেয়েমানুষের যোগ্য কোনো কাজ মেলে না, দূরের গাঁয়ে গতর খাটানির কাজে কেউ তাকে নিতে চায় না, যারা নিতে চায় তাদের চোখে লোভের পোকা। ভুটারী মরবে, তবু পোকামাকড়ের জীবনধারাকে মেনে নেবে না। যে হাত মাথুর ধরেছে, সে হাত বেঁচে থাকতে অন্য কাউকে ছুঁতে দেবে না। এই এত দুঃখ জ্বালার মধ্যেও তার মাথুরের কথা মনে পড়ে, ঐ মানুষটা যেন অলক্ষ্যে থেকে সাহস যোগায়, তার কৌতুক ভরা হাসি মুখ যেন উছলে ওঠে, তোর অত সোন্দর হাত, ফাঁকা থাকলে আমার একদম ভাল লাগে না। দে, ঐ ফাটা চুড়িটাই খুলে দে। মাপ না থাকলে মেয়েছেলের জিনিস কেনা বড় ঝামেলার! কথাগুলো হাজার বার করে মনে পড়ে ভুটারীর। সে তখন ময়লা শাঁখার দিকে তাকিয়ে রং ঝলমলে চুড়ির কথা ভাবে, দু চোখে রঙ্গিন স্বপ্নের বুদবুদ, চুড়ির জলতরঙ্গ, তার এই দৈনন্দিন দীনতা, অভাববোধ সব কিছুকে ভুলিয়ে দেয়। সে শিঙ্গি মাছের মতো দেহ নিয়ে অভাবের পাঁক মাটিতে বেঁচে থাকে। তার এত কষ্টবোধ শোলার চেয়েও হালকা হয়ে যায়। পেটের জন্য একে-একে তার রুপোর মল গেল, হাতের বাজু, পায়ের ঝুঁটি পর্যন্ত বিকিয়ে গেল—এখন এই দু'গাছা রুপোর রুলিই ভরসা। যে ক'দিন রোদ ছিল কটকটে, সেই ঠাঠা রোদ মাথায় গোবর কুড়িয়ে রেল লাইনের ধারে ঘুঁটে দিয়ে রেল কোয়ার্টারেই বিক্রি করেছে সে। এখন, এই বরষা ঝরা বাদল দিনে গোবর ঘুঁটের কারবারও বন্ধ, অথচ সেই কখন থেকে ভাতের জন্য কাঁদছে গুলাপ, তার কান্না অবিশ্রান্ত আষাঢ়ের ধারাকেও বুঝি হারিয়ে দেয়। গালে হাত দিয়ে দূরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে ভুটারী। সকালের আটা ঘ্যাটায় ক্ষিদে তো কমেনি—যেন হাজার গুণ বেড়েছে। অবলা আজও এসেছিল সকালে, ধিক্কার দিয়ে বলল—মরবি রে দিদি, মরবি। তোর সতীপনা শ্মশান ঘাটে গিয়ে মিলবে। আমার কি, আমি তো খেয়ে দেয়ে দিব্যি আচি। কথাগুলো বলে কোমরে ঢেউ তুলে চলে গেল অবলা। অবলার ডাঁটো, দৃষ্টি চমকানো গতরের দিকে তাকিয়ে থাকল ভুটারী—তার মনে পড়ল বিয়ের প্রথম রাতের কথা। কাজল-চন্দনে সুসজ্জিত ভুটারী অমন একটা রঙ্গিলা শাড়ি পরেছিল, যত্নে বাঁধা খোঁপায় জড়িয়েছিল জুঁইফুলের মালা। এখন ফুলের গন্ধ হারিয়ে গিয়ে ভগ্ন শরীর জুড়ে ক্ষিপ্র ক্ষিদের গন্ধ—আর এই গন্ধটাকেই সে এখন সতীনের মতো সহ্য করতে পারে না। জ্বর থেকে ওঠার পর পুরো মুখটাই বিস্বাদে টকিয়ে আছে, কথা বলার অদম্য স্পৃহাটাও ঝিমিয়ে গেছে, শরীর দুর্বল,

হাঁটতে পারে না, গা-হাত-পা থর থর করে কাঁপে—তবু পেটের জন্য ঘরে বসে থাকা শোভন নয়—ভুটারী ভাবল। তা ছাড়া, এই শুনশান দুপুরে অভুক্ত থাকা যন্ত্রণার, তাই সে গুলাপের হাত ধরে অলস, অবসন্ন শরীর ঝাঁকা দিয়ে বেরিয়ে এল ঝুপড়ি থেকে। গুলাপ তখনই তার ডাগর চোখ তুলে শুধোল— এ মা, কুথা যাবি রে ?

—শাক তুলতে। ভুটারী নিস্তেজ গলায় বলল—চ বাপ, খপ্‌খপ্‌ যাব আর আসব। আকাশ এখুন থেমেছে, ফের বরষা নামলে পুরা ভিজে যাব। ভুটারী অবিশ্বাসী, চঞ্চল মতি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল কথাগুলো, অনাগত বৃষ্টির আশঙ্কায় সে আরো জোরে জোরে পা চালালো। কিন্তু ছোট্ট গুলাপ—সে তার মায়ের সাথে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারে না, কখনো দৌড়য়, কখনো এক্কা-দোক্কা খেলার মতো হাঁটে, কখনো খোয়া তুলে নিয়ে মজা করে ছুঁড়ে মারে পাশের পুটুস ঝোপে—এসবই যেন তার শিশুমনের অনাবিল আনন্দ চিহ্ন। অভুক্ত ভুটারী তবু যেন সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে বেশ ঝাঁঝাল স্বরে ধমকে ওঠে, অমন হাঁটলে কখুন পেঁছাবি ? আয়, আয়। জোরে জোরে আয়। তোকে নিয়ে এসেই যেন ঝামেলায় পড়েচি ! অবোধ গুলাপ সময়ের গুরুত্ব বোঝে না, পাটিপাতা রেল লাইনে ভোজবাড়ি খাওয়ার ঢঙে পেছন থেবড়ে বসে পড়ে। ডান হাতের মুঠোয় খোয়া তুলে আগ্রাসী মুখের কাছে নিয়ে যায়, মিচ্‌কি হেসে বলে, হাঁ দেখ মা,...কত্তো ভাত...আমি ভোজ খাচ্ছি ! ভুটারী ঝাপসা চোখে দেখল—নিরেট, শক্ত খোয়াগুলো যেন ভাতের ওপর মাংসের টুকরোর মতো ছড়ানো। এই বিচিত্র অনুভূতিতে তার চোখে জল এল, সে ফুঁপিয়ে ওঠা গলায় আকুল হয়ে বলল—উঠ বাপ, উঠ। অখনো কত্তো পথ হাঁটতে হবে। কচুবন কি ইখানে, সেই কত্তো দূর !

কি বুঝে করুণ মুখ তুলে তাকাল গুলাপ। নাঙা, রুগ্ন, সরু সরু পা দুটোকে টান টান মেলে ধরে কষ্ট ছোঁয়ানো স্বরে বলল, মা রে, আমার পা দুটা ব্যথা করে। তুই আমাকে এট্টা লাল জুতা কিনে দিবি ?

আব্দার শুনে ভুটারী ঘাড় নাড়ে—দিব-রে বাপ, সব দিব। এখন তুই চল।

সীমাহীন আকাশের নিচে ওরা দুজন ক্ষুদ্র দুটো পাখির মতো পথ হাঁটে, নাকি খিদের জ্বালায় উড়ে উড়ে যায় কচুবনের দিকে ! কিছুটা যাওয়ার পর গুলাপ আবার থামল, সপ্রশ্ন চোখ তুলে শুধোল—মারে, বাপ কুথায় গিয়েচে ?

ভুটারীর ঠোঁট কেঁপে ওঠে। চোখের কোণে অভিমান বাষ্প এসে ঘনীভূত হয়, তবু সে ঘ্যানঘেনে গলায় কাতরে উঠে বলে, আমি জানি নে বা। তোর বাপ তো জন্মের যাওয়া গিয়েচে। ঘরে যে দুটো মানুষ, খেল কি মরল সে খোঁজ নেবার তার সময় কুথায় ?

উড়ন্ত, ভাসমান মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে ভুটারী কেমন উদাস হয়ে গেল সহসা, আর শূন্য হাতে ময়লা শাঁখা, সেই সুন্দর হাত দুটো বুকের কাছে চেপে ধরে ভুটারী অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে থাকল পরিব্যাপ্ত সীমাহীন শূন্যতার দিকে।

গুলাপ আবার নতুন বায়না ধরেছে। সে লেবুকোয়ার মতো ঠোঁট নাড়িয়ে বলল—মা, আমি টেরেন গাড়ি চাপব। তুই আমায় টিকিস কিনে দে। আমি বাপের কাছে যাব। খিদেয় নাড়ি ভুঁড়ি চটকে উঠেছিল ভুটারীর, এক একটা মুহূর্ত যেন তার কাছে একটা পরিপূর্ণ দিনের মতো গড়িয়ে যাচ্ছিল, সে বিরক্ত হয়ে গুলাপের দিকে কটমট করে তাকাতেই মাথাটা ঝিমঝিমিয়ে উঠল দুর্বলতায়, চোখে আঁধার দেখল সে—তার মনে হল উই লাগা গাছের মতন সে আজ শক্তিহীনা।

জেদে টইটুম্বুর গুলাপ বলে—হ্যাঁ রে মা, টিকিস কিনে দে না।

—পরে দিবক্ষণ।

—না, তুই এক্ষুণি দে। আমি বাপের কাচে যাব। আমি ঝিক্‌ঝিক্‌ গাড়ি চাপব। গুলাপের আবদার কাঁটা লতার মতো বেড়ে ওঠে, তার খোঁচায় অস্থির ভুটারীর চোখ জ্বলে, বিরক্তিকর রাগে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেয় গুলাপের গালে, পাঁচ আঙ্গুলের দাগ দেখে সে ভুকরে উঠে—মর, মর, তুই মর। তুই মরলে আমার হাড়-মাস জুড়ায়। বড় বাপ-সোহাগী বেটা রে আমার, বাপের জন্য বুঝি নিদ্‌ হয় না! কেমন অদ্ভুত গলায় কথাগুলো বলে সে দু চোখে হাত ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকল কম্পমান শরীরে। ঐ অতটুকু গুলাপ মাকে দেখে বিস্মিত, হতভম্ব। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, এ মা, মা রে। আমি আর টেরেন গাড়ি চড়ব না। এ মা, তুই কথা ক। বলেই সেও সশব্দে কেঁদে উঠল ভয়ে।

ফাঁকা মাঠের বুক চিরে রেল লাইন চলে গিয়েছে কত দূরে, কোন অজানা গ্রাম শহর পথ প্রান্তর পেরিয়ে, তার ঠিকানা ভুটারী বা গুলাপ এখনো পর্যন্ত জানে না। যখন মাটি কাঁপিয়ে ঝড়ো হাওয়ার গতিতে ছুটে যায় রেলগাড়ি, তখন বাস্তবিক তারা হাপুস নয়নে চেয়ে থাকে, চেয়ে চেয়ে ভাবে—জানলার ধারে বসে থাকা উজ্জ্বল মুখগুলোর কথা, তখন বুকের ভেতর মুচড়ে ওঠার ব্যথা যে হয় না, তা নয়। সীমাহীন রেলপথের ঠিকানা জানে না ভুটারী, কিন্তু সে কচুবনের ঠিকানাটা সঠিক জানত। হাঁটু অবধি শাড়ি গুটিয়ে সে যখন জলাভূমিতে নেমে গেল, তখন রেল লাইনের এক পাশে দাঁড়িয়ে গুলাপের আর আঁচল ধরে না, খুশি মনে সে ভাবে—আজ ঘরে ফিরে মনের আশ মিটিয়ে কচুপাতা ডাঁটি-মুথোর ঝোল খাবে। জিভের জল বুঝি বা গড়িয়ে পড়েছিল

ঠোঁটের ওপর, এলোমেলো হাতে তা মুছে নিয়ে সে তার মাকে উৎসাহ দিয়ে বলল—আরো তোল মা, আরো তোল। কি মজা, আচ আমি কচুশাক খাব গো। ছেলের আনন্দ ভুটারীর চোখেও প্রতিবিম্বিত হল, সে যখন কোল পাঁজা করে কচুগাছ নিয়ে জল থেকে উঠে আসবে, তখন তার সামনে সাক্ষাত যমের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল শুয়োরের পাল খেদানো বুড়োটা, হাতের লাঠিটা মাটিতে সক্রোধে বাড়ি মেরে সে বলল—রাখ, এগুলান রাখ, আমার শুয়োরে খাবে। তোরে কে বলল—এগুলান উপড়ে ফেলতে? দিলি তো সব সর্বনাশ করে।

ভুটারী অসহায় চোখে তাকাল—আমি খাব গো, আমাকে দুটা দাও।

—শুয়োর খাদ্য মানুষে খায়?

—খায় বাপ, খায়। ঠেলায় পড়লে খায়।

ভুটারীর কাকুতি-মিনতি ভেসে গেল, ঠেলা মেরে রেল খোয়ায় বুড়ো মানুষটা ফেলে দিল তাকে। ফাঁকা মাঠে ভুটারীকে বাঁচাবার মতো কেউ নেই। কপালের কাছটা ছেঁচে যেতেই সে হিংস্র হয়ে উঠল নিমেষে। বুড়োটার কাঁচা পাকা চুল ধরে সে-ও ছিঁড়ে ফেলতে চাইল হাতের জোরে। আর তাতেই ব্যথা পেয়ে কঁকিয়ে উঠল বুড়োটা—ছাড়, মাগী ছাড়। দুটো কচুগাছের জন্যি তুই কি আমাকে মেরে ফেলবি? তবু হাতের মুঠি আলগা করে না ভুটারী, সে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর চেয়েও হিংস্র হয়ে রেলপাতে বুড়োটার মাথা ওঠায়-নামায়। এক সময় হাঁপিয়ে উঠে সে আলগা করে দেয় হাতের মুঠি। বুড়োটা গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এবার তার গলার স্বর কিছুটা নরম, হ্যাঁগা মা, এই বিষকচু দিয়ে তুমি কি করবা? এ খেলে যে গাল-মুখ একেবারে ফুলে যাবে! শুয়োরে খায় বলে বীজগুলান আমি পুঁতে ছিলাম। এখুন দেখি গাছগুলান চড়চড় করে বাড়ছে, অথচ শুয়োরগুলান তার ধারে-কাচেও ঘেষেনা। বাঁচতে চাইলে এগুলান ফেলে দাও মা। ভুটারী তবু ফেলল না, ঘরে ফিরে মাটির হাঁড়িতে চাপিয়ে দিল যত্ন করে। নুন-মরিচ দিল, কিন্তু হলুদ ছিল না, তাই পাশের ঘর থেকে এক ফোঁটা হলুদ এনে খুশি মনে মিশিয়ে দিল কচু ঝোলে। সবুজ পাতা ডাঁটি সেদ্ধ হয়ে বাসনা ছাড়ল পুরো ঘরে, আর থাকতে না পেরে গুলাপ লোভী গলায় বলল—টুকে দে না রে মা, চাখব।

—আমি গা ধুয়ে আসি, তারপর। ভুটারীরও খিদে লেগেছিল জব্বর। সে তাড়াহুড়ো স্বরে গুলাপকে বলল, কাঠগুলান চুলার ভেতর ঠেলে দে। আমি যাব আর আসব। দেখিস বাপ, আগুন যেন না নেভে। বুড়া আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েচে। ঠিক মতন ফুট না খেলে গলা বড় কুটাবে। ঘরে তেঁতুল নেই যে সামাল দিব।

ভুটারী চলে যাওয়ার পর স্বাধীন হয়ে গেল গুলাপ, সে জ্বলন্ত উনুনে কাঠ ঠেলে দিয়ে ভাবল—এক হাতা কচু শাক মা আসার আগে খেয়ে নিলে মন্দ কি? মা তো জানতেই পারবে না! এই ভেবে সে লোহার হাতাটা সজোরে ঢুকিয়ে দিল মাটির হাঁড়িতে। বিচ্ছেদের একটা শোকধ্বনি হল—তারপরই চোখের পলকে হাঁড়ির তলাটা খসে পড়ল জ্বলন্ত চুলায়, লতলতে ঝোল-শাক সব জায়গা করে নিল ছাই আগুনে। গুলাপ ভয় বিহ্বল চোখে দেখল, তার বুকে তখন ভয়ের হাতুড়ি ঘা মারছে—সে ভয়ে কাঠ হয়ে কাঁথাকানির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল বিল ইঁদুরের মতো, তবু তার বুকের ঢিস্‌ঢিসানি শব্দটা গেল না। মায়ের পায়ের চেনা শব্দটা কানে যেতেই তার পুরো শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

অনেক দিন পরে ভুটারীর গলায় গুনগুন করছিল গান, কিন্তু ঘরে ঢুকতেই কে যেন গলায় পা দিয়ে থামিয়ে দিল তাকে। শাক-পাতা পোড়ার কুচুটে গন্ধে বিষিয়ে উঠল তার নাক। সে উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল চুলার পাশে, ক্ষিদেয় গা-টা চটকে উঠতেই সে বাজখাঁই গলায় ডেকে উঠল—গুলাপ, এ গুলাপ?

সাড়া দিল না গুলাপ, কিন্তু ভুটারীর বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না—এই সর্বনাশের মূলে তারই আদরের দুলাল গুলাপ। রাগে চিড়বিড় করছিল গা, নিমেষে খিল কাঠটা তুলে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বেরিয়ে গেল বাইরে, ফিরে এল সেই রাগের আগুনে বাতাসের ঝট্‌কা লাগিয়ে। সে ঘেমে গিয়েছিল বিশ্রীভাবে, তার পরনের ভেজা শাড়ি জড়িয়ে গিয়েছিল সেই ঘামে, তবু ফুঁসে ওঠা গলায় সে চিৎকার করে ডাকল—গুলাপ, গুলাপ—

ছোট ঝুপড়ি ঘরে গমগমিয়ে উঠল সেই স্বর, আর তখনই ভয় দুরুদুরু পায়ে, ঠক্‌ঠক্‌ কাঁপতে কাঁপতে গুলাপ হুমড়ে পড়ল কাঁথাকানির ঢিপির ওপর। হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ল—ছেঁড়া কাঁথা, চটের বালিশ আর পচা খেজুর পাতার তালাই। তার ওপর গুলাপ যেন অসহায় ডাঙার মাছ। কেঁদে কেঁদে বলল—মা রে, মারিস নে। প্রথমে হ্যাঁচকা টানে গুলাপকে শূন্যে তুলে মেঝেয় আছড়ে দিল ভুটারী, তারপর তার বুকের উপর চড়ে বসে শুধোল—বল, হাঁড়িটা ভাঙ্গলি কেনে, অখন কিসে আমি ভাত ফুটাবো?

—মা রে, আমি ভাঙ্গিনি রে! ডুকরে উঠল গুলাপ।

—ফের মিছে কথা? অন্ধ রাগে ভুটারী চাপ দিল গুলাপের কচি নরম বুকে, তারপর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, তোর খুব ক্ষিদে, তাই না? আয়, জন্মের খাওয়া খা। দলা দলা ছাই মাখা কচুশাক এনে ভুটারী পাগলের মতো গুঁজে দিতে লাগল গুলাপের নাকে-মুখে। গুলাপ ওক্‌ ওক্‌ করে বলল—এ মা, মরে যাব রে…

—মর, তুই মর। ভুটারীকে যেন খাওয়ানোর নেশায় পেয়েছে। তার নেশাটা ছুটে গেল তখন—যখন গুলাপের নাক মুখ দিয়ে রক্তের পাশাপাশি বেরিয়ে এল কচুশাক, যখন সে তার নিথর দেহটা নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে, মুখে গ্যাঁজলা নিয়ে পড়ে থাকল মেঝেয়। পাখি উড়ে গেছে—যখন বুঝতে পারল ভুটারী, তখন সে সে বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে উঠল উম্মাদিনী গলায়—এ বাপ, গুলাপ রে—কথা ক। তোর জন্য আমার বুকে কত দুধ এয়েচে—উঠ্ বাপ, উঠ্। দুধ গুলান খেয়ে নে। আমি তোকে টেরেনের টিকিস্ কেটে দিব। তুই তোর বাপের কাচে যাবি না? ভুটারী আছড়ে-পাছড়ে কাঁদল, তার উষ্ণ চোখের ধারায় শিশিরের মতো ভিজে গেল গুলাপের বুক।

পাড়া প্রতিবেশীরা খবর পেয়েই ছুটে এল তার ঝুপড়িতে। ভৎর্সনা করে বলল—মুখপুড়ী, গলা টিপে মেরে ফেল্লি ছেলেটাকে? আহা রে, কি কপাল নিয়ে সে এই পোড়ার দেশে জম্মেছিল!

সবাই চলে যাওয়ার পর আঁধার নেমে এল ঝুপড়ির ঘরে, ভুটারী সেই হিমসাপ অন্ধকারে খুনী হাতদুটোর দিকে চেয়ে চোখের জল ফেলল অনবরত। তার মনে পড়ল মাথুরের কথা—তোর অতো সোন্দর হাত, ফাঁকা থাকলে আমার একদম ভাল লাগে না।···ভুটারী রে তোর এই হাত দুটা লক্ষ্মীর হাত। অমন তুলো নরম···পদ্ম ঘেরাণ হাত এই আকাট চাষার কপালে জুটবে—তা আমি সপনেও ভাবি নি! ভুটারী কেঁপে কেঁপে উঠল মাথুরের চিন্তায়। সে ফিরে এসে এই হাতে কাচের চুড়ি পরাবে, এই হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে ছেঁড়া বিছানায় ···এই হাতই মাথুরকে বেড়ে দেবে ক্ষিদের জাউভাত। ভুটারী আর ভাবতে পারছিল না, শুধু আলুথালু শরীরে টলমল পায়ে সে হেঁটে এল রেল লাইনের ধারে।

দূরে বাঘের চোখের মতো জ্বলে উঠল মেল ট্রেনের আলো, দানব ইঞ্জিনটা এগিয়ে আসার আগেই সে সপাট শুয়ে পড়ে হাত দুটো পেতে রাখল রেল লাইনে। মেল ট্রেন তার কব্জি দুটো কেটে নিয়ে হা হা হাসিতে বাতাস ভরিয়ে চলে গেল দূর দেশে। এই সোনার মাটিতে নষ্ট পোকার দেহ নিয়ে মূর্চ্ছিত হল ভুটারী।

মাথুর যখন চাষের কাজ সেরে ফিরে এল, তখনও ভুটারী হাসপাতালে। দু হাতে তুলের ব্যাণ্ডেজ—কব্জিহীন হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। সে রিক্ত নিঃস্ব চোখে মাথুরের দিকে তাকাল। বোবা চোখ বেয়ে অবিশ্রান্ত ধারা নামল জলের।

মাথুর তাকে ভরসা দিয়ে বলল—কি করবি বল, সব আমাদের কপালের দোষ! তুই ভাল হয়ে ওঠ, না হলে আমি ঐ খাঁ খাঁ ঘরে ফিরব কি করে?

তখনো তার ছেঁড়া লুঙ্গিতে বাঁধা প্লাষ্টিকের শাঁখা, চুড়ি আর লোহা-পলা। ভুটারী সব হারানো চোখে তাকাল, আমি আর কোনো দিন শাঁখা সিঁদুর পরতে পারব না গো! সধবা হয়েও আমি যে বিধবা···ও গুলান তুমি ফেলে দাও। গুলাপের প্রসঙ্গ উঠতেই আবার ডুকরে উঠল ভুটারী, মাথুর বলল—দেখ, এই রেলগাড়িটা তার জন্যি এনেচিলাম। ঘরের পাশে রেল অথচ ছেলেটা আমার কুনো দিন রেলে চাপল না!

ভুটারী চেষ্টা করল ঐ সুন্দর খেলনা রেল গাড়িটা ছুঁতে, কিন্তু পারল না—সরে সরে গেল গাড়িটা। আর বিশ্রী ভাবে তখনই কেঁপে উঠল তার হাত। রক্তক্ষরণ হল। দেখে শুনে মাথুর বলল—দে, উটা আমি ফেলে দিই, কি হবে রেখে—যার জন্যি এনেচিলাম সে তো আর নেই! শুধুমুধু ওটা আমাদের দুখ দেবে।

ভুটারী দিল না, হুমড়ে পড়ে আগলে রাখল। বলল, আবার যদি আমার কোনো দিন হাত হয়, তখন এই গাড়িটা কাজে দেবে। বলেই আশ্চর্য চোখে তাকাল।

—আর এই চুড়িগুলো? মাথুর শুধোল।

ভুটারী বলল, রেখে দাও। সেই হাত ধরে যে আসবে, তাকে আমি পিঁধাবো। তার চোখে ঝলসে উঠল স্বপ্ন, দৃষ্টি দূরাগত তারার চেয়েও স্পষ্ট।

মাথুর কিছু না বুঝে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাল।

ভুটারী চোখের জল মুছে বলল, আমি আবার মা হব গো। আমার গুলাপ আবার ফিরে এয়েচে, সে আমারে মাফ করেচে।

মানচিত্র

পরণে ছেঁড়াখুঁড়া ফুলপ্যাণ্ট। পায়ে বাবুর ছেলের ফেলে দেওয়া জুতো! তার সাথে লাল মোজাটা দিব্যি মানায়। ছেলেটার নাম নানা। বয়স খুব বেশি হলে আট। হাঁটা-চলা অবিকল সিনেমার হিরোগুলোর মত। সে নাকি খুব ভাল নাচে। তার বাবা গুহিরাম বলল, 'বিশ্বেস না হয় একবার পরখ করে দেখুন। নিজের বেটা বলে নয়। লাচা-গানায় বেটা আমার ওস্তাদ!'

চা দোকানের সামনে কথা বলছিল গুহিরাম। শীতের সকাল। কুয়াশা চিরে রোদ উঠেছে অল্প স্বল্প। নানা হাত-পা কুঁকড়ে বসেছিল পিচ রাস্তার এক পাশে। গাড়ি-ঘোড়ার কমতি নেই তখন। পথের ধুলো নাকে-মুখে ঢুকে নাজেহাল অবস্থা।

স্টেশন চত্বর সকালবেলাতেই মেছোবাজার। কাল রাতে এই পাহাড়ী এলাকায় নানাদের আগমন। সংগে তার মা আছে। কুন্তী ময়লা চেহারার নজর কাড়া মেয়ে ছেলে। শরীর-স্বাস্থ্য, চোখের চাহুনি সবই তার অদ্ভূত। সুর্মাটানা চোখ দুটোয় রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। তবু লালচে ঠোঁটে হাসির ছোঁয়া। সিঙ্গাড়ায় কামড় মেরে সে নানার দিকে হাপুস চোখে তাকাল। চোখের ইশারায় নিমেষে গা ঝেড়ে ফুলবাবুটি হয়ে উঠে দাঁড়াল নানা। গুটিয়ে যাওয়া পায়ের মোজা টেনেটুনে ঠিক ঠাক করে বলল, 'লাচব বাবু, লাচব। কিন্তুক জবরদোস্ত গানা না হলে লাচব কি করে?'

গুহিরাম ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। সে প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। গায়ে তার তাপ্পি মারা তুষের চাদর জড়ানো। নানাকে চেগে উঠতে দেখে সে কিছুটা উৎফুল্ল, চায়ের কাপের তলানী টুকু সুড়ুৎ করে মেরে দিয়ে বলল, 'বেটা আমার বহুৎ সোয়ানা। লাচবে যখুন বলেচে,—সে নির্ঘাৎ লাচবে। তা বাবু, হিট্ গান ছাড়া কি এই ঠাণ্ডা মরশুমে কোমর লড়ে। টেপ থাকলে চালাই দিন। তারপর দেখুন, বেটার আমার কেরামতি।'

হোটেলওয়ালা মুরলীধর। খদ্দের ধরতে তার দোকানে অষ্ট প্রহর টেপ বাজে। টেপ না বাজলে ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে হোটেল। হোটেল ব্যবসার মজাটাই নাকি মাটি হয়ে যায়!

হাভাতে, উড়োনচণ্ডী মানুষগুলোকে দেখে সকালবেলায় মনটায় তার জোয়ার আসে। ধান্দা জমাতে মানুষকে কত রকমের যে ধান্দা করতে হয়! সকালবেলায় একটু নাচ-গান হলে মন্দ কি। উড়তি-ফিরতি খদ্দের কিছু ধরা

যায়। বিক্রিটাও জমে। সে তিনশ জর্দার পানখিলিটা মুখে পুরে বলল, 'নাচ ভাল লাগলে পুরা একটা টাকাই বকশিস দিব। নাচ বেটা, নাচ।'

টেপ চলতেই বাতাসে ভাসল হিন্দি গানের সুর। শীতের নরম সকাল গরম হলো হিন্দি গানের কড়া সুরে। চটকদারী বাজনায় দুলে উঠল নানার কোমর। বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গি করে সে নাচল দমতক। তার মোজা গুটিয়ে গোড়ালীর কাছে কুঁকড়ে গেল। হাঁপিয়ে উঠে সে বলল, 'বাবু, টুকে পানি।' কুন্তী জল এনেদিল কাচের গেলাসে। ঢকঢক করে জল খেয়ে নানা বলল, 'আরও লাচব বাবু ?'

—'হ, হ লাচ।' গুহিরাম পয়সার লোভে উসকে দিল ছেলেকে। কামচোর মানুষটার কাছে পয়সাই হলো সব। নানা স্তব্দ চোখে তাকাল। তখন চারপাশে ভিড় জমেছে শোলবুড়ির পাশে চড়বড়ানো পোনার মত। সবাই চাইছে নাচ আরো হোক। মুরলীধর বলল, 'নাচ থামালি কেনে ? বলেছি তো নাচ পসোন্দ হলে পুরা একটা টাকাই বকশিস দিব।'

হাত পা নাড়িয়ে, কোমর দুলিয়ে এক নাগাড়ে নাচছিল নানা। গানের তালে তালে পা ফেলছিল সে। ঝাঁকুনিতে মাথার চুলও নড়ছিল তালে তালে। উপস্থিত সবাই থ। ঐ অতটুকুন ছেলে এমন সুন্দর নাচতে পারে ভাবাই যায় না! নানা কখনো মিঠুন-অমিতাভ'র পোজে। কখনো রাজেশ খান্না ঢঙে। কখনো শেকলে বাঁধা ভালুকছানার মত। ঐ অতটুকু ছেলে কত কায়দা যে জানে! ওর ছন্দময় হাত-পা-কোমর সব যেন কবিতার মত। নদীর গতির মত স্বাভাবিক সুন্দর—ছন্দময়।

কিছুক্ষণ নাচার পরে টুপটুপ করে ঘাম ঝরছিল নানার। গুহিরাম ছেলের কাণ্ড কারখানা দেখছিল নিবিষ্ট চোখে। গর্বে তার চোখের দৃষ্টি কুঁচকান। ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলল, 'তালিম পেলে এ ছেলে বড় মাপের ড্যান্সার হবে।'

কেউ বলল, 'ডিসকো হোক, ব্রেক ড্যান্স হোক।'

নানা সব তাতেই পারঙ্গম। কুন্তী ড্যামা-ড্যামা চোখে তাকিয়ে। তার কোলে কলাকাঁদির মত দেড়-বছরের একটা মেয়ে। ঘ্যান ঘ্যান করে দুধের জন্য কাঁদছে। মেয়ের মুখে দুখ ধরিয়ে দিয়ে কুন্তী কিছুটা উদাস। তার আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে আছে নানার ছোট ভাই। হাতে মচমচি বিস্কুট। কোয়াশ বেয়ে গড়িয়ে নামছিল লালা।

নানা দেখল তার নাচের থেকে মায়ের খোলা বুকের দিকে অনেকের শকুন দৃষ্টি। তার কষ্ট সাধ্য নাচ দেখার চেয়েও মাকে চোরা চোখে দেখতে অনেকেই ব্যস্ত। এমন হলে মন খারাপ হয়ে যায় নানার। এই জন্য নাচের সময় কুন্তীকে

দূরে কোথায় রেখে আসে ওরা। গুহিরামের বয়স হয়েছে, মানুষের চোখের ভাষা সে বোঝে। সাতঘাটের জল খেয়ে-খেয়ে হাড়মাংস তার পাকুড়িয়া। মানুষের নজর দেখেই সে কদর করে মানুষের। কাল ভোরের ট্রেনে শীতে কাঁপতে কাঁপতে সে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে হাজির হয়েছে এখানে। এক জায়গায় ধান্দা বেশীদিন জমে না। কম পয়সার পুঁজি এক জায়গায় থেকে গেলে লাভের গুড়ে বালি! কুন্তী দিনের বেলায় কাচের চুড়ি বেচে বেড়ায়। গুহিরাম মাদুলি বেচে ছেঁড়া পলিথিন বিছিয়ে। মানুষের আজকাল মাদুলি—তাবিজে মন নেই। কাচের চুড়িও মেয়েরা পরতে ভালবাসে না। আজকাল হলো গিল্টি গহনার যুগ। তবু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পেটের দায়ে ঘুরে বেড়াতে হয় তাদের। এই ঘুরে বেড়ান'র মধ্যেই তাদের বেঁচে থাকা। সংসার-ধর্ম পালন করা।

প্লাটফর্মের শেষ মুড়োয় এই জব্বর শীতে ঘুমোতে পারেনি ওরা। নানা বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। চায়ের খোঁজে গিয়েছিল গুহিরাম। আবছা আলো-আঁধারে মুখ নিচু করে বসেছিল কুন্তী। সেই সময় এক বাবু এসে ধরে নিয়ে গেল তাকে। প্রথমে দশ টাকা—রাজি হয়নি কুন্তী। পরে বিশ টাকা—তবু, রাজি হয়নি কুন্তী। শেষে ত্রিশ টাকায় রফা। ফিরে এল ঘণ্টা খানিক পরে। তখনো ভোর হতে ঢের দেরী। শীতের দীর্ঘরাত কিছুতেই যেন ফুরোতে চায় না। সামান্য ঘুম ঘুম এসেছিল নানার। মায়ের ফিসফাস কথায় ঘুম ছুটে গিয়েছিল তার। কিছুদূরে দাঁড়িয়ে ছিল কুন্তী। বাবুটা তার হাত ধরে টানছিল। গুহিরাম চাপা ধমক দিয়ে বলছিল, 'যা না যা। না গেলে খাবি কি? তোর তো একার পেট নয়—পাঁচটা পেট!' কুন্তী অবাক। দু'চোখে জলের ধারা। দ্বিতীয় বাবুটা লোলুপ গলায় বলেছিল, 'চল, তোকে পঞ্চাশ টাকা দেব।' —'বাবু, মরে যাব গো!'—বলেই ডুকরে উঠেছিল কুন্তী। তবু শেষ পর্যন্ত তাকে যেতেই হলো। পেটের মত শত্রু যে আর কেউ নেই!

মরা জ্যোৎস্নায় মায়ের আর্তি মাখানো কথাগুলো নানার মনে গিঁথে গিয়েছিল তখন। দুঃখ হয়েছিল মায়ের দুঃখী মুখটা দেখে।

নাচতে-নাচতে সেই কথাগুলোই আবার মনে পড়ল নানার। ফিরে আসার পর কুন্তী নানার সাথে কোন কথা বলেনি ভোররাতে। ছেঁড়া শাড়িটা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল ঠাণ্ডা কংক্রীটে।

আজও সেই বিমর্ষ চোখে তাকিয়ে আছে কুন্তী। হাতভর্তি রঙিণ চুড়ি, সেই চুড়িতে কোন শব্দ নেই। চোখের দৃষ্টি উচ্ছ্বাসহীন, মরা-মরা। জম্পোস একটা গান বাজছিল টেপে। নানা নাচছিল স্ফূর্তিতে কোমর দুলিয়ে। ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলেন এক বাবু। সেফটিপিন দিয়ে নানার বুকে

গিঁথে দিল দু'টাকার নোট। এই বাবুকেই কাল ভোররাতে নানা দেখেছিল তার মায়ের সাথে। মনটা বিষিয়ে উঠলেও প্রতিক্রিয়াহীন নানা। দু'টাকা বকশিস পেয়ে তার নাচের গতি বেড়েছে। নাচতে-নাচতে সে ঝুঁকে যাচ্ছে মাটির দিকে। ঘাম ঝরছে টুপটুপিয়ে। গায়ের জামাটা জায়গায়-জায়গায় ভিজে গিয়েছে ঘামে। চ্যাটচ্যাট করছিল গা। গুহিরাম বলল, 'বেটারে, পিরানটা ইবার খুল্লে ফ্যাল্। বাবুদের মনের মতন লাচ দেখা। খুশি হলে বহুৎ রুপিয়া দেবে তোকে। সেই রুপিয়া দিয়ে তুই এট্টা পাউরুটি কিনে খাবি।'

সোয়েটার খুলল প্রথমে, তারপরে জামা। নানার গায়ে তখন শুধু গেঞ্জি, হাত-পা নাড়িয়ে বুক নাচাচ্ছে সে। নাচতে-নাচতে ঝুঁকে যাচ্ছে মাটির দিকে। যেন মাটিতে সে তার উঁচু মাথা ঠেকিয়ে দেবে।

আবার ক্যাসেট বদলাল মুরলীধর। যত রোদ ফুটছে, ভিড় বাড়ছে তত। বাতাসে ভাসছে হিন্দি গানের হিট সুর। নাচতে নাচতে ক্রমশ কাহিল হচ্ছিল নানা।

এমন সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন আরেকজন বাবু, তাঁর হাতে পাঁচ টাকার নোট ভাঁজ করা। তিনি টেনে টেনে বললেন, 'নাচ। নেচে কাঁপিয়ে দে জমিন। তাহলে তোকে আমি পাঁচ টাকা বকশিস দেব।'

উৎসাহ পেয়ে গুহিরাম বলল, 'বেটারে, গেঞ্জিটা এবার খুলে ফ্যাল। দিমাগ লড়িয়ে লাচ। এখানকার বাবুরা বড় দিলদার।'

গুহিরামের নির্দেশে নাচতে-নাচতে গেঞ্জি খুলে কুন্তীর দিকে ছুঁড়ে দিল নানা। তারপর যথাক্রমে বেল্ট এবং প্যান্ট। জুতো মোজা খুলে সে এবার শুধু শর্ট প্যাণ্ট পরে খালি গায়ে নাচছে। শরীর উপচে দরদরানো ঘাম; নাচের তালে তালে ঘামের বিন্দু গুলোও যেন নাচে।

শীতের রাতে কুন্তীর কপালেও ফুটে উঠেছিল এমনধারা ঘাম। মরা জ্যোৎস্নায় গুহিরামের কোলে মাথা দিয়ে কুন্তী কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। হিন্দি গানের স্বরে যেন কান্না ভাসে। নাচতে-নাচতে হঠাৎ থেমে যায় নানা। স্বর কেটে যায় নাচের।

তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন আরেক বাবু। দশ টাকার নোট দেখিয়ে বলেন, 'ভালো করে নাচ। তাহলে এই দশ টাকা তোকে আমি বকশিস দেব।'

দাপনায় বাড়ি মেরে নানাকে উৎসাহ দিয়ে গুহিরাম বলে, 'লাচ বেটা, লাচ। লাচলে বহুৎ রুপিয়া দেবে বাবুরা।'

নাচতে-নাচতে নানা কেমন করুণ চোখে তাকাল! এবার হিসাব মত তার উদোম হয়ে নাচার কথা।

গুহিরাম উৎসাহ দিয়ে বলল, 'খুলে ফেল প্যানটুলুন। বাবুদের ইবার ক্ষ্যাপাশিবের লাচটা দিখা। ই লাচ হলো সত্যিকারের লাচ, এক্কেবারে আদি লাচ।'

উদোম হয়ে নাচার বাসনা ছিল নানার। কিন্তু মায়ের উদোম শরীরটা চোখের কোনে ভেসে উঠতেই সে কাতরে উঠে বলল, 'বাবু, মরে যাবো গো। আদি লাচ আমি নাচতে পারবো নি।'

তার কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল সমবেত দর্শক। কুন্তী নানার হাত ধরে বলল, 'চল বাপ, ছায়ায় চল। আচ তুই আমার মান বাঁচালি।'

নির্বিকার গুহিরাম তখন খুচরো পয়সা কুড়োচ্ছে রাস্তায়। তার কুঁজো হওয়া শরীরটা অবিকল ভারতবর্ষের মানচিত্রের মত দেখায়!

হেঁসুয়া

গুঁদলিবিচার মাড় খেতে গিয়ে বিষম খেল ঠুনকি। তার চিকন হাতে আটটা করে কাচচুড়ি। নাকের সঁকড়ি মুছতে গিয়ে রিনঝিন শব্দ হলো চুড়ি-গুলোর। সেই শব্দে মাংরা তাকাল ঘাড় ঘুরিয়ে। তার দু'চোখ নেশায় ভরা। একেবারে কটকটে লাল। দেখলেই চমকে ওঠে কলজে। কিন্তু ঠুনকি হলো বরাবরের ভ্রুক্ষেপহীন। একবার শুধু চোখ মেলে তাকিয়ে সে আবার বাটিটায় চুমা দিল লাল ঠোঁটের। পেট তখন বেবাক খালি। কেবল নাড়ি-ভুড়িগুলো চটকায়। একটা টকুয়া স্বাদ পুরো মুখটাতে ছেয়ে থাকে। অথচ, বস্তির বুড়োগুলো বলে, গুঁদলিবিচা ক্ষীরের মতন খেতে। চোঁ-চোঁ করে পিয়ে নিলে জানটা একেবারে জুড়িয়ে যায়। ভর পেট খেলে ঢাকের তালার মত টানটান থাকে পেটের চামড়া। তখন হাঁটতে-চলতে কষ্ট। ক্ষিদেও লাগে-না বহু সময়।

মাংরার হাতেও ছিল অ্যানামেলের বাটি। বাটি ভর্তি গুঁদলি ক্ষীর। চুমুক দিয়ে খেতে গেলেই গোঁফ দাড়িতে লেগে যায়। তখন কালো মোচ-দাড়িও সাদা। গুঁদলি হলো ঘাসের বীজের মত, পিষিয়ে নিলে অবিকল যেন চাল-গুঁড়ো। পুব ধারের জমিগুলো গুঁদলি চাষের উৎকৃষ্ট জায়গা। শ্রাবণমাসের মাঝামাঝি সময়ে ঠুনকি যখন গুঁদলি ক্ষেতে দাঁড়ায় তখন তাকে মনেহয় পাহাড় দেশের রাণী, তার কোন অভাব নেই, কষ্ট নেই। সে যেন পক্ষিস্বভাবিনী কোন নারী।

মাংরা হলো বরাবরের ছন্নছাড়া। তার পেটা শরীর, দড়ির মত পেঁচানো কর্মক্ষম হাত-পা—সব মিলিয়ে সে এক শক্তিধর মানুষ। দিন রাত এক করে খাটতে ভালবাসে, অথচ খেটেও তার দু'বেলা পেটের ভাতের যোগাড় হয় না। আষাঢ় আসলেই অসাড় হয়ে যায় দেহ। শ্রাবণে হাতে-পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে হাজা হয়। তখন পাহাড়ের কোলের মাঠটাতে ধান চারাগুলো বাড়ে, নতুন পাতা ছেড়ে কিশোরী চোখে তাকায়। তখন মাঠের কাজও শেষ। ঠিকাদাররাও এসময় জু' নেয়। বর্ষায় ঠিকেদারী কাজ হয় না, ফলে টানা দু'-তিন মাস হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয় মাংরাকে। তখন গুঁদলি বিচা, মাড়ুয়া বিচাই ভরসা। ভাতের মুখ দেখা ভাগ্যের ব্যাপার।

মাংরার ছোট্ট ঘরে মাত্র তিনখানা পেট। কুঁহার হলো তাদের দশ বছরের বেটা। সে বড় চালাক-চতুর। হনুমানের চেয়েও অনায়াস দক্ষতায় সে গাছে উঠতে পারে যখন-তখন। বেল, তেঁতুল, মহুয়া, আতা—যখন যা পায় তখনই

সে ভেঙে ঘরে নিয়ে আসে। আর পাহাড়ী মৌচাকগুলো দেখলে তো কথাই নেই—সে যাবে সবার আগে আগে মধু ভাঙতে, সবখানেই তার সক্রিয় ভূমিকা।

আজ সে মাংরাকে বলল, তুই ধীরে-সুস্থে খা বাপ। আমি যাচ্ছি নদীর ধারে। মহাজন আসলে তোরে আমি খবর দিয়ে যাবো। তুই আরাম করে খেয়ে-দেয়ে নিদ্ যা।

কুঁহারের কথায় ভরসা পেয়েছিল মাংরা। ছেলেটা যে ভয়ানক রকমের চালাক-চতুর এ বিষয়ে তার আর কোন সন্দেহ নেই। মহাজনের মোটরবাইকের শব্দ পেলেই ঝাঁকড়া মহুয়া গাছটার ডাল থেকে ময়ূরকণ্ঠী সাপের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে ডাঙায় নেমে আসে কুঁহার। তারপর, মহাজনকে তরাস চোখে এক ঝলক দেখে নিয়েই দে-দৌড়। তার দৌড় দেখেই বস্তির লোকগুলো বুঝে যায় বিপদ আসছে কুঁহারের পিছে-পিছে। বিপদ তো হাওয়ার আগে ছোটে। তার হাত-পা মানুষের চেয়ে লম্বা। ধারাল নখ দিয়ে মানুষকে চিরে চিরে ফালা করে দেয় বিপদ। তাই বিপদকে এই পনের ঘর মানুষের বড় ভয়। তারা মাংরার বেটাটাকে সাবাশি দেয়। পিঠ চাপড়ে বলে, তুই হলি এট্টা পাহাড়ী মুশা (পাহাড়ী ইঁদুর)। এ যুগে ধড়িবাজ মুশাগুলোই বাঁচে। তুই অনেক বড় হবিরে কুঁহার, তোকে দেখে আর ছুয়া (ছেলে) গুলা শেক্ষা নেবে।

মহাজনের নাম ভিকু সিং। শহরে তার মোজায়েক করা দোতলা বাড়ি, প্রকৃত অর্থে সে হল বিড়ি ব্যবসায়ী। আশ পাশের দশ-বারোটা বস্তিতে প্রায় শ' আড়াই নিরন্ন মানুষ তার কোম্পানীর বিড়ি বাঁধে। হাজার বিড়ির হিসাব ধরেই দরদাম। কেঁদুপাতা, মশলা, সুতো সব মহাজনের। শুধু আঙুল দুটোকে খসখসে করার জন্য যতটুকু ছাই লাগে তা হলো বস্তিওলার। মহাজন দাদন দেয় ফি-বছর। বিশেষত, বর্ষাকালটা বস্তিওলাদের দাদনের টাকায় চলে। খরার মরসুমে এদেশে মাটির বুকে বড় বড় হা-মুখ দেখা দেয়। সেই হা-মুখ হলো কঠোর, কঠিন দারিদ্র্য, তখন কাজ বাড়ন্ত। মেয়েগুলো কামিন সেজে ঠিকাদারের ট্রাকে ঘোরে। দিনান্তে ফিরে আসে। মরদগুলো পাহাড়ে যায় কাঠ কাটতে। কাঠের দেশে এখন বড় কাঠের আকাল! ফলে, ঘরের মানুষ-গুলো নেশা করে চৌপায়ায় নিদ্ যায়। কেউ আবার ছাগল-গরু নিয়ে আলের উপর নিমছায়ায় বসে থাকে ঝিম ধরে। মাথার চুল ছেঁড়ে, খুসকি চুলকোয়। গায়ের খোঁস-পাঁচড়া চুলকে বিষ নখে ঘা করে। ঘায়ে খুন ঝরিয়ে ঘরে ফিরে আসে। মহুয়া কিংবা শালবিচি সিজিয়ে পেট ভরায়। এমন ভয়াবহ জীবনের মাঝখানে মহাজন শব্দটাই আতঙ্কের। তাই তারা সর্বদা তটস্থ

থাকে। ভয়ে আধমরা। ঐ শব্দটা যেন বিষফোঁড়া। মাংরা শব্দটাকে যমের মত ভয় করে। তার ভয়ার্ত, পাংশু, সাদাটে মুখের দিকে তাকিয়ে গ্রীষ্মের বিনজয় নদীর মত শুকিয়ে যায় ঠুনকির বুকটা। সে ভুমামাছির মত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে আতঙ্কে, কি হবে গো, মহাজন যদি মোরমেনকে (আমাদের) থানায় ধরি নিয়ে যায়? সেবার দারোগাবাবু এমন মেরেছিল এখনো সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না মাংরা। ফি-রাতে শুয়োরের তেল দিয়ে মালিশ করার সময় দাগা দেওয়া ষাঁড়ের মত দমতক চিল্লাতো মাংরা। আসলে বে-জায়গায় মার গতরটাকে কমজোরী করে দেয়। আর গতর কমজোরী হলে কুঠিয়া ধরে খাঁজ-খুঁজ, গিঁটগুলোয়। মাংরা এখন ভালমতন ছুটতে পারে না। তাই, মহাজন আসার খবর পেলেই সবার আগেই তেবাঁকা মানুষের মত খোঁড়াতে খোঁড়াতে আশ্রয় নেয় পাহাড়ী ঝোপগুলোয়। ঠুনকি চিতল হরিণ, তার পায়ের দৌড় এই মহল্লায় আর কারোর নেই। ফলে সে যায় সবার পিছনে। সে ঐ ভীতু মানুষটার মত দূরের ঝোপটায় আশ্রয় নেয় না। সে আশেপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে পড়ে থাকে। বুড়ো গামার গাছটাকে পাশ কাটিয়ে আলপথ দিয়ে বস্তিতে ঢোকে মহাজন। তার পায়ে থাকে ভারি বুট, পোষাক অনেকটা পুলিশগুলোর মতন। গাঁয়ে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেলে তার মাথটা বারুদবাতির মতো জ্বলে ওঠে। চোখের সামনে যা পায় তাই ভাঙচুর করে ছাড়ে। ভেশিণ্ডগাছ, মারশিখাড়াগাছ উপড়ে ছুঁড়ে দেয় বেড়ার উপরে। হাঁস-মুরগিগুলোকে ঢিলের ঘায়ে জখম করে ঝুলিয়ে নেয় হাতে। ঘর-ঘর গিয়ে সে নাম ধরে-ধরে ডাকে। সাড়া না আসলেই খিস্তি-খেউর। মোচে তা দিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, দাঁড়া শালারা, এবার তোদের নামে উকিলের চিঠি দিচ্ছি। আমার টাকা মেরে তোরা সব পালাবি কোথায়? ইঁদুরের গর্তে ঢুকে গেলেও আমি তোদের হিড়হিড়িয়ে টেনে বার করব। তোদের চামড়া ছাড়িয়ে ডুগডুগি না বাজানো পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসবে না। ভিকু সিংয়ের ভারি চেহারা থরথর করে নড়ে। তখন আশ-পাশের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকা মানুষগুলো ভয়ে পাথর চোখে তাকায়। ভিকু সিংকে তারা যমরাজের মত ভয় করে। মানুষটা পারে না হেন কাজ বুঝি আর নেই। গেলবার ফিরে যাওয়ার সময় গাদীখেলার ছেলে-মেয়েগুলোর চুলের মুঠি ধরে মাথায় মাথা ঠুকে দিয়ে পালিয়ে গেল সে। ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছিল হাফ লেংটো ছেলে-মেয়েগুলো। তাদের প্রত্যেকের কপালে একটা করে আস্ত সুপারি চিহ্ন। তাদের বাপ-মা গুলো ফিরে এসে তাতে জলকানি চাপায়। হা-হুতোশ করে বুক চাপড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ভিকু সিংহের আজ আসার কথা। হাট করতে গিয়ে এমন দুঃসংবাদ বয়ে

এনেছে বিক্রম। সেই থেকে পুরো বস্তি উত্তাল। বস্তি বুড়ো বলেছে, আজ যা হোক একটা মীমাংসা হোক বাপজানেরা। নাহলে এভাবে পেলিয়ে-পেলিয়ে বাঁচা যাবে না। মানুষ তো আর ঢুহা নয় যে, সাপ দেখলেই গর্তে ঢুকবে? মীমাংসার কথায় শিউরে ওঠে অনেকেই। মীমাংসার অর্থ হলো দাদনের টাকা ঘুরোণ দেওয়া। কিন্তু এই আক্রা-গণ্ডার দিনে এতো টাকা কার হাতে আছে? মহুয়া বেচার টাকাগুলো সব মহাজনের পায়ের উপর নামিয়ে রেখে এসেছে বস্তিবুড়া। তাতেও ভিকু সিংয়ের ক্ষিদে মেটেনি। সে মোচে তা দিয়ে নাক কুঁচকে বলেছে, এতো হলো সুদের টাকা, আসল কোথায়?

বস্তিবুড়া হাত কচলে বলেছে, এর মধ্যেই আসল আচে মহারাজ। এই টাকা গুলান নিয়ে তুমি মোদের নিস্তার দাও। তুমার ভয়ে আমরা বৌ-বাচ্চা নিয়ে শুতে পারিনে। তুমার ভয়ে আমরা মরে আছি গো। তুমি আমাদের এই ভয় থিকে বাঁচাও।

কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠেছে ভিকু সিং। তার থলথলে মুখের মাংসগুলো ষাঁড়ের গলচর্মের মত নড়ে। লোকটা টাকার বিছানায় নিদ্ যায়, তবু তার টাকার লোভ হাঁড়ি খাওয়া কোঁউয়াগুলোর অধিক। বস্তিবুড়ার কাতর অনুনয়-বিনয়ে মন গলেনি ভিকু সিংয়ের। সে তেজের সাথে বলেছে, টাকা না দিতে পারো তো বিড়ি বাঁধ। বিড়ি বেঁধে-বেঁধে আমার টাকা শোধ দাও। দাদন আমি তোমাদের পোড়া মুখ দেখে দিইনি। আজ তিন সাল থেকে তোমরা আমায় ঘুরাচ্ছো। টাকা না পেলে এবার আমি থানায় যাব।

থানার কথায় বস্তির ছেলে-বুড়ো এমন কি পোয়াতী বউগুলোর পেটের ছানাটা পর্যন্ত ভয় পায়। পাহাড়ের ধারের বস্তিটায় প্রায়ই হাবিলদার আসে। বস্তির মানুষগুলোর নামে আখছারই চোর অপবাদ। তাই, পুলিশ আসার সংবাদ পেলেই যে যেমন পারে গাঁ ছেড়ে পালায়। দুএকদিন এদিক সেদিক ঘুরে খোঁজ-খবর নিয়ে আবার গাঁয়ে ঢোকে। বাচ্চা-কাচ্চাগুলোরও ভয়-ডর নেহাত কম নয়। বাপ-মায়ের আজন্ম ভয়টা তাদের বুকে তাবু গেড়েছে। পুলিশ কিংবা মহাজন এলে তারা খেলা ভুলে ভীতু গুড়ুলপাখির মত পালিয়ে যায়। দূর থেকে লক্ষ রাখে রাগী মানুষের গতিবিধি। ভাঙচুরের সাক্ষী থাকে তারা। মুখ ফাঁক করে ড্যাবা ড্যাবা চোখে নীরব তাকিয়ে থাকে।

ঠুনকিটা আজকাল খায় বেশী, তার পেটে মাংরার সন্তান পাকা নিমফলের বিচার মত নড়ে-চড়ে। বউটা ভার গতর নিয়ে আগের মতন হরিণী বেগে ছুটে গিয়ে নিজেকে আড়াল করতে পারে না। ছুটতে গেলেই তার তলপেটটা ব্যথা করে, ভয়ে পা দুটো শুকনো কাঠির চেয়েও অসাড় হয়ে পড়ে। চোখ-মুখ বেরিয়ে আসার উপক্রম। তাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছে মাংরা। সে ঠুনকিকে

—বলেছে, মহাজন আসলে তুই ঘরের ভেতর হাড়িয়া হাঁড়িগুলোর পিছে লুকাই যাবি। মহাজন তো ঘর তালাসী করে না। আঁধার ঘরে সে তোরে খুঁজেও পাবে না। আর যদি পায় তুই তার হাতটা কেমড়ে দিবি। মাংরার কথায় হারানো সাহসটা ফিরে পায়নি ঠুনকি। রাগে তার চোখ জ্বলে উঠেছে বুনোচিতার মত। গলায় বিদ্রূপ মিশিয়ে সে বলেছে, ছিঃ, তুমাদের মুখ দেখতেও লাজ লাগে! তুমরা বিটাছেলে হয়েও মেয়েমানুষের অধম। এট্টা মানুষের ভয়ে পুরা বস্তি পালায় এটা ভাবতে আমার নাক-কান কাটা যায় গো!

মাংরা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। শেষে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলে, যার টাকা আছে তার গায়ে এট্টা হাতির তাগৎ। তার হাত দুটা হাতির শুঁড়ের মত নিষ্ঠুর। তাকে ছাগল-ভেড়া-বিল্লী-চুহা সবাই ভয় পায় রে।

—তুমি তো আর বকরি নও; তুমি হলে গিয়ে হাত-পাওয়ালা মানুষ। তুমার অতো ডরলে চলে?

—ডরলে যদি জান বাঁচে তাহলে সেই ডরায় কুনো পাপ নেই। খালি বাটিটা নামিয়ে রেখে ঠুনকির মুখের দিকে অবোধ চোখে তাকিয়ে থাকে মাংরা। বউটার যে সাহস আছে তার ছিঁটে-ফোঁটাও তার বুকে নেই। অথচ, পাহাড় দেশে তার ঘর। শাল-পিয়াল-মহুয়া-করঞ্জ আর গামার শিশমের কঠিন বুকের মত তার বুক। আজ সেই বুকে যেন উই ধরেছে। ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে হাড়-পাঁজরা। মাড়ুয়া কিংবা গুঁদলিগুঁড়ায় কত আর জোর! ঢোক-ঢোক খেয়ে নিয়ে একবার নামুচাপ হলেই পেট বেবাক খালি। তখন পেটের গহ্বরে বাতাস। রক্তে ক্ষুধাজনিত ঝিমুনি। চুনবাহ্যি মুরগাগুলোর মত ঝিমুনি আসে গতরময়। আর চোখ দুটোয় ঘুমের সরের টনটনানি। মাংরা ইচ্ছে থাকলেও আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। মহাজনকে মনে হয়—বাঘ। হ্যাটা বাঘ নয়—খুনপিয়া বাঘ। ঠুনকিকে সে কি করে বোঝাবে শুধু গায়ে তাগদ থাকলেই মনের জোর বেড়ে যায় না। মানুষের মন হল গাছের শিকড়ের মতন। অতবড় একটা গাছ দাঁড়িয়ে থাকে সে তো শুধু শেকড়ের ভরসায়। আর শেকড় থাকে মাটির জোরে। মাংরার পায়ের তলায় ভূমি নেই, সে কি-করে সোজা হয়ে গাছের মত দাঁড়াবে? তাই বউয়ের ভরা পেটে হাত বুলিয়ে সে বলে, তোর পেটেরটা যেন সিঙবোঙার দয়ায় ঐ অর্জুন গাছটার মত দড়ো হয়। কত ঝড়-ঝাপটা গাছটার উপর দিয়ে চলে গেল তবু, দেখ এখনো কেমুন সিধা মাথা! আমি তো দুধীলতার চেয়েও লতলতিয়া নরম। উপরওয়ালা আমাকে সব দিল, শুধু শিরদাঁড়া দিল না।

এ কথায় আরো চটে ওঠে ঠুনকি। সে বিতৃষ্ণায় মুখ বেঁকিয়ে বলে,

শিরদাঁড়া সব মানুষেরই থাকে। তবে সেটা কারোর হাড়ের, কারোর আবার অলকলতার, টুকে চাপ দিলে পুট্ পুট্ করে ভেনুগে যায়।

কুঁহার এলো খরাবেলায়, তার গায়ে যেন চুলার তাপ। ছেলেটা নদীর ধারের মহুয়াগাছটায় চড়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শহুরে যাওয়ার পথটার দিকে। এ বস্তিতে কোন পড়া-লেখার ইস্কুল নেই। ইস্কুল আছে ইটভাঁটিওলা গাঁ টায়। মোরাম ফেলা রাস্তায় গেলে তা মাইল দুয়েক আর জংগলের পথটায় মাত্র আধা পথ। কুঁহার সেখানে মাংরার সাথে গিয়ে নাম লিখিয়ে এসেছে কিন্তু ভুল করেও সে ইস্কুলে যায় না। ইস্কুলে যাওয়ার কথ য় তার গায়ে ফোস্কা পড়ে, সে ছাগলের পাল খেদিয়ে নিয়ে পাহাড়ের কোলে ক্ষুদে জংগলটায় চলে যায়। সারাদিন টো-টো করে ঘুরে শালপাতা আর শুকনো ডালপালার বোঝা বেঁধে নিয়ে ঘরে ঢোকে। ঘরে বসে নিমখাঁচি ফুঁড়ে শালপাতার দোনা (ঠোঙা) বানায় ঠুনকি। মাংরা সেই দোনা নিয়ে আড়াই মাইল পথ ঠেঙিয়ে দু'টাকা শ-দরে বেচে আসে খাবার দোকানে। শুকনো কাঠ আর দোনা বেচার পয়সায় সে মাট্টিতেল, মিঠাতেল আর নুন-চাল কিনে ঘরে ঢোকে। ঠুনকি সেই লাল আউস ফুটিয়ে দিলে কলাইকরা থালায় সমান তিনটে ভাগ হয়। কুঁহার এই দশ বছর বয়সে একটা বড় মানুষের সমান খায়। আর তার হজমশক্তি এত বেশী—যার জন্য খুব ঘনঘন খিদেও পায়। বস্তির লোকে তাকে ভালবাসে তার চালাক-চুতুর-ছটফটে তিতলি স্বভাবের জন্য। আর তার কাঁচ নজরটাও খাসা। রোদের মধ্যে বহুদূরের জিনিসও সে দেখতে পায়, কখনো তার চোখ ঝলসে ওঠেনা হলাহল ভর্তি রোদে। গাঁয়ে ঢোকার মুখে যে নদী আছে বর্ষায় তাকে সবাই মান্য করে, ভয় পায় দলছুট হাতিগুলোর মতন। বর্ষায় তার জল গেরুয়া রঙা, গতিতে সে তখন উড়োজাহাজ। গর্জনে ক্ষ্যাপা হাতিও হার মানে। তার বুকের ওপর কাঠের একটা পুল আছে। সেই নড়বড়ে বুড়াদের দাঁতের মতন কাঠপোল পেরিয়ে মোটর সাইকেল গাঁয়ে ঢোকে না। মহাজন তাই বাধ্য হয়ে মোটর সাইকেলের স্টার্ট থামিয়ে রেখে আসে পোলের ধারে। আর কুঁহার থাকে নদীর ওপিঠের মহুয়া গাছটায়: দূর থেকে মহাজনের মোটর সাইকেলের শব্দ শুনেই সে বাঁদর ছানার চেয়েও নিপুণ পটুতায় এ ডাল-সে ডাল বেয়ে ঝুপ করে ঝুল খেয়ে নেমে পড়ে গাছ থেকে। তারপর বস্তিমুখো দে-ছুট। বস্তির সবাই তাকে বলে উদ্‌বেড়াল। উদ্‌বিড়াল যে কি তা আগে জানত না কুঁহার। মাংরা একদিন উদ্‌বিড়াল মেরে লাঠির ডগায় ঝুলিয়ে নিয়ে ঘর এলো। ঠুনকি তখন হাড়িয়া চাউল রোদে দিয়েছে তালাই পেতে। এই উদ্‌বিড়ালটা তার খুব চেনা। বস্তিতে প্রায়ই আসত শিকারের লোভে। আর প্রতিদিন হাঁস-মুরগি কিছু না কিছু ধরে নিয়ে

পালাত। ঠুনকির মুরগির ছানা দুটো এর পেটেই গিয়েছে। মাংরাকে সেই উদ্‌বিড়ালটা শিকার করতে দেখে তার খুব আনন্দ। এতদিন পরে একটা কাজের মত কাজ করেছে ঘরের লোকটা। সেদিন উদ্‌বিড়ালের মাংস খেতে-খেতে ঠুনকি বলেছিল, উদ্‌বিড়ালটাও মহাজনের মত আসত। সে আসলে মুরগিগুলা ছানাগুলাকে পেটের নিচে নিয়ে ঠোঁট শানিয়ে রুখে দেঁড়ুত। তা, একটা মুরগির যা সাহস আছে তা তুমাদের পুরা বস্তির কারোর নেই।

—চুপ যা। ধমক দিয়ে ঠুনকিকে থামিয়ে দিলেও মাংরার বুকের ভেতরটায় যেন উদ্‌বিড়ালে আঁচড় কাটত সব সময়। বিবেক জ্বালায় জ্বলে যেত মাংরার সর্বাঙ্গ। সে ভীতু চোখ দুটো দিয়ে ঠুনকির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারত না। সব সময় মনের ভেতর জাবর কাটত ঠুনকির বিষ কথাগুলো।

মহাজনকে কিভাবে রোখা যায় তাই নিয়ে সাঁঝের বেলায় ছাতিমতলায় মিটিং ডাকল বস্তিবুড়া। বাঁশের মাচা তক্তাপোষের সমান উঁচু। তাতে সবাই এসে জড়োসড়ো হয়ে বসল। মাংরার মুখ দুই হাঁটুর মধ্যে লুকানো। বস্তি-বুড়ার পক্ক কেশ, নোলা-ঝোলা চামড়া। হিজিবিজি কাটাকুটি দাগে ভর্তি মুখটা বয়সের কামড়ে এখন মানুষের মত দেখায় না। তবু, সেই জটিল কুৎসিৎ মুখটা থমথম করছিল দুশ্চিন্তায়। বিড়িতে সুখটান দিয়ে বস্তিবুড়া বলল, পাকা ধানের ক্ষেতে হাতি নামলে আমরা দল বেঁধে সবাই হাতি খেদাই। বুনো শুয়ারগুলাও আমাদের কম জ্বালায় না। তাই, বাপ সকল তুমাদের কাছে আমার একটা নিবেদন…। কথা শেষ না করে বস্তিবুড়া জমায়েত সকলের মুখের দিকে তাকায়, তার গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জিটা খুলে ফেলে বলে, হা দেখ, ইখানে বিঘোৎখানিক চেরাদাগ। ভাল্লুতে নখুনের চোট মেরেছিলো। কিন্তু সেই বুনো ভাল্লুও মানুষের সাথে শেষতক লড়াই করে পারেনি। আমার বাপ শুধু একটা শালবল্লী নিয়ে সেই দাঁতাল ভাল্লুর থাবা থেকে বাঁচিয়ে ছিল আমায়। না হলে সেদিন আমার জান যেত। আমার বাপ যা পেরেছে আমরা কেনে তা পারবোনি? মহাজনের গায়ে হাতির চেয়ে জোর বেশী নেই। মহাজন হলো দু' হাত-পাওয়ালা মানুষ। আমরা এতগুলান মানুষ একটা মানুষকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না—তুমরা কি বলো? তাই বলছিলাম কি—আর ভয়-ডর নয়, এবার সাহসে তুমরা বুক বাঁধো। না হলে চরম ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের। আমাদের ছানাপুনাগুলো বড় হয়ে আমাদের ছিঃ -ছিকার করবে, ঘেন্নায় ছেপ ফেলবে। তুমরা কি চাও পুরো বস্তিটাই ভয়ের আখড়া হয়ে যাক?

বস্তিবুড়ার কথা শুনে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল মাংরা। অঙ্গার চোখে তাকিয়ে সে বলল, আমার ঘরে তীর-ধনুক আছে। তুমরা যদি আমায় সাথ

দাও তাহলে মহাজনের বুকটা আমি বিষতীর দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেব। সে আমাদের আজ তিন সাল ধরে জ্বালাচ্ছে। মহুয়া-নিম-করঞ্জ আমরা তিন সাল থেকে পাইনা। মহাজনের দাদনের টাকা শোধ করতেই তা চলে যায়। কতদিন আমাদের ঘরের বৌগুলা কুসুম তেল দিলে চুল বাঁধেনি। এর একটা বিহিত না করলে পেটের ছানাগুলো আমাদের দুষবে।

বস্তিবুড়া সায় দিতেই একজোটে সবাই সমর্থন করল মাংরাকে। বুড়া পাকা চুলে হাত বুলিয়ে বলল, সে আমাদের দাদন দিয়ে অসময়ে বেঁচিয়েচে। তাই আমার খুনোখুনির মধ্যে যাব না। আমরা হলাম পাহাড়দেশের মানুষ। আমরা আমাদের পাথর চাটাং বুক দিয়ে মহাজনকে এটকুবো। বস্তিবুড়ার কথা শুনে প্রতিজ্ঞায় টনটনিয়ে উঠল কালো-কালো শিরা ফোলা হাতগুলো। বুকে সাহস পুরে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল মানুষগুলো।

তখন ধান কাটার মরসুম। পাহাড়তলার ক্ষেতগুলোয় রাতের অন্ধকারে সার সার নেমে আসে হাতির পাল। ফসল খেয়ে, নষ্ট করে রাতের আঁধারে পালিয়ে যায় চতুর জীবগুলো। বুনো শুয়োরের অত্যাচারে বস্তির মেয়েগুলো ধানক্ষেতের ধারে-ধারে গেঁড়ি-গুগলি খুঁজতে যেতে পারে না। দাঁতাল শুয়োরের খপ্পরে পড়ে পাশের গাঁয়ের একজন ঘায়েল হয়েছে! লোক বলছে, সে বেচারী আর বাঁচবে না! মাংরা বল্লম হাতে ক্ষেত পাহারা দেয় অষ্টপ্রহর। কুঁহার গামছায় বেঁধে ভাত পেঁৗছে দিয়ে আসে তার বাপকে। তার হাতে থাকে ধার হেঁসুয়া। ফাঁকা আলে একা হাঁটা-চলা করতে তার কোন ভয় লাগে না। সে যখন হাঁটে তখন বুকের হাড়গুলো টানটান করে হাঁটে। তার মা তাকে সাবধান করে বলে, এত সাহস ভাল নয় বেটা। তোকে নিয়ে আমার জব্বর ভয়। তুই কুনদিন বেপদ বাঁধিয়ে বসবি। মায়ের কথায় তোয়াক্কাহীন তাকায় কুঁহার। সে চোখ বড় বড় করে বলে, আমার কোন কিছুতেই ডর লাগে না। আমার কাছে হাতি, শুয়ার, মহাজন সব এক একটা বিলচুঁহা (বিলের ইঁদুর)। বিলচুঁহার দাঁতগুলোর চাইতে আমার দাঁত আরো শক্ত। এই দাঁত দিয়ে আমি বুট ভাজি খাই। ভাতের মধ্যে পাথর থাকলে চিবিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করি। যার দাঁতে ধার আছে সে কুনদিন কাউকে ডরে?

কুঁহার যে ডরতো না তার প্রমাণ সে একদিন রাখল। খরাবেলায় সে ভাত নিয়ে যাচ্ছিল মাংরার জন্য। আলের উপর সে তার ছোট ছোট পা গুলো ফেলে খুব দ্রুত হাঁটছিল। দু'ধারে পাকা ধানগাছ লুটিয়ে পড়েছে ফসলের ভারে। হঠাৎ ধানক্ষেত থেকে উঠে এল একটা শামুক খেগো জাত ক্ষরিস সাপ। তার মাথায় খড়মের ছাপ। কুঁহারকে দেখে এক হাত ফণা তুলে পথ আগলে দাঁড়াল সাপটা। তার হিসহিসানো শব্দে কুঁহার পিছিয়ে

গেল কঁপা। কিন্তু সাপটা পথ ছেড়ে নড়ে না, চড়ে না ; শুধু ফণা দুলিয়ে ডানে-বাঁয়ে নড়ে। অথচ, বাপের জন্য ভাত নিয়ে যেতে হবে তাকে। বেলা বাড়ছে, আর অপেক্ষা করা চলে না। রাগে ঘেমে-নেয়ে কুঁহার তার হাতের ধার হেঁসুয়াটা সাপের মাথা লক্ষ করে ছুঁড়ে মারল সজোরে। আর তাতেই দু'টুকরো হয়ে আলের দু'দিকে ছিটকে পড়ল সাপটা। হাততালি দিতে-দিতে আনন্দে ছুটে গিয়েছিল কুঁহার। হেঁসুয়াটা ঘাসে মুছে নিয়ে সে যখন উঠে দাঁড়াতে যাবে তখন দেখে নদীর ওপারে মহাজন। বিষধর সাপ দেখে যত না ভয় পেয়েছিল, তার দ্বিগুণ ভয় পেল কুঁহার। গলা ফেড়ে ডাকতে গিয়ে সে বুঝতে পারল, তার গলা থেকে কোন স্বর বেরচ্ছে না, ভয়ে যেন তার কণ্ঠনালী বুজে গিয়েছে।

সদর্পে বস্তিতে এল মহাজন। ঠুনকি তখন চাল বাচছে চৌপায়ায় বসে। মহাজনকে দেখে বাঘ দেখার মত চমকে উঠল সে। ভয়ে ঘরের ভেতর পালাতে যাবে তখন তার লুটানো আঁচলটা পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল মহাজন। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, মাংরা কোথায় ? ডাক শালাকে। আজ তার আমি খুন খাবো। —বলেই সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ঠুনকিকে। দেওয়ালে মাথা ঠুকে গেল বউটার। ঘেমো মুখের আগুন রঙা চোখ দুটো মুহূর্তে উঠল দপদপিয়ে। টালমাটাল পায়ে সে তবু পেট চেপে ঢুকে এল ঘরে। বেরিয়ে এল ধারাল বটি হাতে। মহাজনকে সে কেটেই ফেলত। শুধু বাঁচিয়ে দিল বস্তিবুড়া। সে তাকে শান্ত করে বলল, এই চশমখোরের খুন যদি বস্তিতে হয় তাহলে বস্তিবাসীর অমঙ্গল হবে। তারচে, একে তুই আমার হাতে ছেড়ে দে। লভী মানুষকে কি ভাবে সাজা দিতে হয় তা আমি হাড়ে-হাড়ে জানি।

ছাতিমতলায় বস্তির লোকেরা ভাকু সিংকে বেঁধে রাখল। দেড়দিনের মাথায় বস্তিবুড়া রগড় করে শুধাল, মহারাজের কি ভোখ লাগে ?

কোন মতে ঘাড় নাড়ল মহাজন। তার জন্য মাড়ুয়া গুঁড়া সিজিয়ে আনল মাংরার বউ ঠুনকি। বস্তিবুড়া বলল, দে, মহারাজের মুখে ঢেলে দে। বেচারী দেড়দিন হলো কিছু খায়নি !

গোগ্রাসে মাড়ুয়া সিজানো খেয়ে নিল ভাকু সিং। খাওয়ার পরেই হড়হড়িয়ে বমি করল সে, চোখের ধারা মুছে বলল, এ কি বিষ খাওয়ালে আমায়, আমার বুক জ্বলছে বস্তিবুড়া। আমাকে একটু জল দাও।—তার কথায় হা-হা করে প্রাচীন মানুষটা হাসল। তারপর, কেমন গম্ভীর গলায় বলল, মহারাজের জয় হোক। এই মাড়ুয়া, গুঁদলি গুঁড়া খেয়ে পুরা বস্তিটাই বেঁচে আচে। আমরা তোমায় বিষ দিইনি গো। যে বিষ আমরা রোজ খাই—সেই

বিষ তুমাকেও খাইয়েচি। একদিনে যদি এতো অস্থির হও তাহলে, আমাদের কথাটা ভাবো তো।

বস্তির একমাত্র কুয়ো থেকে জল তুলে আনল ঠন্‌কি। সেই জল কাচের গেলাসে ভরে এগিয়ে দিল ভাকু সিংয়ের দিকে। পিপাসায় জিভ শুকিয়ে আসছিল ভাকু সিংয়ের, প্রবল তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম। ব্যাকুল হাতে জলের গেলাসটা ধরে নিয়ে চুমুক দিল সে। তার জিভের উপর কুয়োর পোকা গুলো কিলবিল করে নড়ে উঠল তখনি। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল ভাকু সিং, জলে যে পোকা, এ আমি চোখে দেখে খাবো কি করে? আমি যে মানুষ—

—তা তো আমরা দেখতেই পাচ্চি। কঠিন চোখে তাচ্ছিল্য মিশিয়ে তাকাল বস্তিবুড়া, তারপর মুখের দানা দানা ঘাম গুলো গামছায় মুছে নিয়ে বলল, এই জল খেয়েই এতদিন ধরে আমরা বেঁচে আচি। আমাদের বস্তিতে একটা চাঁপাকল নেই। খরানীতে নর্দা শুকিয়ে গেলে ঐ একটা কুয়োর উপর পুরা বস্তির উৎপাত। এবার ভাবো তো মহারাজ, দিনের পর দিন আমরা কিভাবে বেঁচে আচি? আমাদের ছানাপুনা গুলা টুকে কাপুড় পায় না পিন্‌ধবার, আমাদের ঘরের বৌগুলান পেয়োতী হয়েও দুটা পেট ভরে ভাত পায় না। তারা মাড়ুয়া আর গুঁদলি ঘ্যাটা খেয়ে-খেয়ে ভাতের সুয়াদ ভুলে গিয়েচে। এ অবস্থায় দামাল হাতি আসে, দাঁতাল শুয়ার-ভাল্লু আসে, চশমখোর মহাজন আসে—ইবার তুমি বলো মহারাজ আমারা কুথায় দেঁড়ুই। মিছে বলি না, আমরা তুমার দাদন ঘুরোন দিয়েচি। তুমার বিঁড়-বেঁনধে-বেঁনধে বস্তির মানুষগুলোর শিরদাঁড়া ধেপে কুঁজ ফুটেচে পিঠে। তাদের বুকে এখন কাশরোগ! তারা সময়মত দুটো খেতে পায় না। এর পরেও মানুষ এতো বেহায়া হলে চলে? আমাদের যেটুকুন জমি আচে—সেটুকুন যদি কেড়ে লাও, তাহলে আমরা কুথায় দেঁড়ুই বল তো!

কথা শুনতে-শুনতে ক্লান্তিতে বুঁজে আসে মহারাজের চোখের পাতা। মাংরার ছেলেটা মাঠ থেকে ফিরে সেই গেলাস ভর্তি জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে নেয়। মাংরা একটা বুনো শুয়োর মেরে এনেছে ধানক্ষেতে ফাঁসজাল পেতে। ছাতিম-তলায় কাঠখড় জুটিয়ে এনে পুড়িয়ে খাবে পুরো বস্তিবাসী। তার আয়োজনে তৎপর কয়েকটা মানুষের শিরা চাগান হাত। বস্তিবুড়া গিয়ে আগুন ধরাল ডাঁই করা শুকনো খড়খড়ে কাঠগুলোয়। আগুনের লেলিহান শিখার আঁচ পেল ভিকু সিং। সেই আঁচে নিজেকে হয়ত কিছুটা সেঁকে নিতে চাইল মাঝ বয়েসী, প্রবল-পরাক্রমী মানববিদ্বেষী মানুষটা। ঝলসানো বুনো শুয়োরটার দিকে তাকিয়ে সে কি শিক্ষা পেল কে জানে! শুধু কাতর গলায় বস্তিবুড়াকে বলল, আমার দাঁড় খুলে দাও। আজ আমার চোখের ঠুলিটা সরে গেল।

দড়িটা খুলে দিল মাংরার ছেলে কুঁহার। একটা গিঁট কিছুতেই খুলছিল না, সেটা ধার হেঁসুয়ায় চোখের নিমেষে কেটে দিল কুঁহার। মহাজনের দিকে তাকিয়ে সে একটা অবজ্ঞার হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, দেখো বাবু, ইয়ার কত্তো ধার ! বলেই সে আবার দাঁত দেখিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। সেই অপ্রতিরোধ্য কাশফুল হাসির দিকে তাকিয়ে ভয়ে ছোট হয়ে আসল ভিকু সিংহের চোখ। একটা বিশ টাকার নোট সে বাড়িয়ে দিল কুঁহারের দিকে। কুঁহার টাকাটা নিল না, ফিরিয়ে দিল চরম ঘৃণায়। ঐ অতোটুকু ছেলে নিমেষে চোখ-মুখ কঠিন করে বলল, ইখান থিকে পেলিয়ে যাও বাবু, আর এসো না। নিজের চোখেই দেখলে তো আমার হেঁসুয়াটায় কত্তো ধার !

ঢ্যাঙা আলের উপর দিয়ে পড়িমরি করে ছুটে যাচ্ছিল ভয় কাতুরে মহারাজ। আর তার পেছনে হেঁসুয়া হাতে দশ বছরের অপ্রতিরোধ্য কুঁহার।

রাক্ষস অথবা ঘুঁটেল পুঁটি

নামলা ভুঁইয়ে জল দাঁড়ালে ছড়ছড় করে পুঁটিমাছ। রুপালী গতরে ঝিলিক মারে রোদ, গর্বভরে লেজ বেঁকিয়ে চলে যায় ঘুঁটেল পুঁটির দল। কি তার রূপ—একবার তাকালে চোখ ফেরাতে পারেনা ভাসানী, মনের কোনে ঢেউ ওঠে থিরথির যেন তার বুকের খোদলে সাঁতরে সাঁতরে যাচ্ছে ক্রমাগত। কেমন একটা গা চাগানো, সিরসিরানো অনুভূতি—যা এই বিলের পাড়ে দাঁড়ালে রক্তের ভেতরে ভুস করে পানকৌড়ি পাখি হয়ে জেগে ওঠে। আজ বিলমাঠ ফাঁকা, পথও শুনশান। হাওয়া মরা-নিথর। শুধু ভাসানীর কানের ভেতর তার মায়ের কথাগুলো তার ছেঁড়া সেতারের কোঁকানীর মত বাজে। শোভা-বুড়ি তার মা। বয়সের ভারে সে এখন একদলা মাংস, শুধু দৃষ্টিটুকু জোনাকি হয়ে দপদপ করে জ্বলে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাসানী মনের জোর হারিয়ে ফেলে, নিজেকে সে বড় অসহায় ভাবে ইদানিং। অসহায় ভাবার অনেক কারণ। সংসারের মাথা হলো তার দাদা—ক্ষুদিরাম। সে হলো ছন্নছাড়া দলের সর্দার। মাথার উপর সেয়ানা বোন, ঘরে বুড়ি মা—এসবে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। চিন্তাহীন, দায়-দায়িত্বহীন মানুষ উড়ো পাতার সমান। তার গায়ে দায়িত্বের গহনা পরানো সাজেনা। ক্ষুদিরাম গাময় পঁই পঁই করে ঘুরে বেড়ায়, পথ চলতে চলতে বিড়বিড় করে বকে, কখনো গাছের ছায়ায় বা মন্দিরের চাতালে বসে সে আপন মনে ভাঙা গলায় গান গায়, মেজাজটা বিগড়ে গেলে ঐ ক্ষুদিরামই দু'হাতে মাথার চুল ছেঁড়ে, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে গাল পাড়ে গ্রামের মহাজন-সুদখোর রাঙাবাবুকে। ক্ষুদিরামের ভাষায়, রাঙাবাবু 'বাবু' নয়, হারামীর গাছ ! ও গাছের ছায়ায় দাঁড়ালে মানুষের কোনো সুখ হয়না, অসুখ বাড়ে।

ক্ষুদিরামকে এ গ্রামের সবাই বলে, পাগলা ক্ষুদে। সে পাগল এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই কারোর, তবু মাঝেমাঝে সে এমন নাড়া দেওয়া লোম চাগানো কথা বলে যা শুনলে অনেক ভালো মানুষেরও পিলে চমকে যাবে। ভাসানীও বুঝে উঠতে পারেনা তার এই পাগল দাদাটা এত কথা মাপজোক করে বলে কী করে !

ক্ষুদিরাম প্রায়ই সতর্ক করে বলে, জানিস বুন, ঘুঁটেল পুঁটি বড্ড চালাক। ওরা অল্প জলে ছড়ছড়ায়, চড়া রোদ উঠলেই জলের তলায় সিঁদিয়ে যায়। তখন এট্টা পোকার মতন দেখায়। তা, তোদের ঐ রাঙাবাবু এট্টা পোকার সমান।

কোনদিন ওরে আমি গলা টিপে মেরে ফেলব। দাদার অসংলগ্ন কথোপকথনে আঁতকে ওঠে ভাসানী ; টানা, ডাগর, কাজল মাখা বিস্ময়ভরা চোখ তুলে শুধায়, তোর এত মানুষটার উপর রাগ কেনে ? জানিস, ঐ মানুষটা কত ভয়ঙ্কর। কত হুঁশিয়ার।

—জানি, সব জানি। ও ব্যাটা আমার করবে কি ? পুঁটিমাছের দৌড় কে না জানে বল, অল্প জলে ওদের যত মাতব্বরি, খবরদারি। শাল-শোল দেখলেই ভয়ে ছুটে পালায়। তার আবার বড় বড় কথা। তাহিলে কলের গান বেরতান : ও ভাই, দ্যাখো হাঁটু জলে, পুঁটি ফর ফর কইর‍্যা চলে, দ্যাখো, বোয়ালের ছা, মাগুরের ছা, ভরা কলসী আওয়াজ করে না……। কি বুঝলি ? নামলা ভুঁইয়ের আলে দাঁড়িয়ে গানের কলি গুলো মনের জলাশয়ে ঘাই দেয় ভাসানীর, সে অন্যমনস্ক চোখে দূরের শ্যামল গালিচা পাতা শস্য-ক্ষেত্রের দিকে তাকায়। শ্রাবণের প্রথমে মরাটে ধানচারাগুলো সদ্যঋতুবতী কিশোরীর লাজুক চোখের মোহময়ী দৃষ্টি ছুঁয়ে রোদের সাথে সহেলী পাতানো খেলায় মত্ত। এই খেলা যেন ভাসানীর বুকে, চোখে, শরীরের পরতে পরতে। তবু, এই তাৎক্ষণিক রোদকে সে কোন মতে মেনে নিতে পারেনা, মানতে গেলেই বুকের ভেতর বজ্রপাতের শব্দ হয়, সে নিজে ভীত বোষ্টমীমাছের মত ছটছটিয়ে ওঠে অন্তরে, বাহিরে, রক্তের অণুকণিকায়। বিস্তীর্ণ ধানমাঠে হাওয়া দুলছে, ফুলছে। এই আমোদিত রূপ ভাসানী সহজভাবে চোখে মেখে নিতে পারেনা। ঘরে তার মা রোগ শয্যায় শায়িত, তার কোলবসা চোখের তারায় পৃথিবীকে আঁকড়ে থাকার সুতীব্র বাসনা, কিন্তু ভাসানী জানে—তার মা বেশিদিন এই পৃথিবীর মায়ায় ছায়ায় শ্বাস নিতে পারবেনা। বেলা শেষের যে মলিন রঙ তা তার মায়ের চোখে মুখে বিসর্জনের প্রতিমার মত ছড়িয়ে পড়েছে। ভাসানীর সাধ্য কি তাকে মুছে ফেলবে।

পথ চলে গিয়েছে গ্রামের ভেতর, সিঁদেল চোর অতিসন্তর্পণে যেমন ঢুকে পড়ে গৃহস্থ ঘরে—ঠিক তেমন। কাঁচা পথের দু-ধারে হাড়মটমটি আর আস-শ্যাওড়ার বন, বর্ষার জল পেয়ে ঘনঘোর সবুজ। শাঁওনের মেঘের ছায়ায় চকচকে পাতার সমষ্টি যেন ভ্রূকুটি মেলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে ভাসমান জলজ আদ্রগন্ধময় মাতৃস্বভাবিনী মেঘরাশিকে। ভাসানী দুরুদুরু বুকে নামলা ভুঁইয়ের আলপথ পেরিয়ে কোনমতে উঠে আসে কাদাপথে। এতদূর থেকে তাদের পচাখড়ের দোচালা ঘরটা দেখা যায় না, শুধু কংকালসার গাঁ খানার অস্পষ্ট বিলীয়মান জলছবির ধোঁয়াশা রেখাটা দৃষ্টিগোচর হয়। আর তখুনি ধড়াস-পড়াশ করে ওঠে তার জল ছুঁইছুঁই যৌবন বেলার একলা মনটা। কত দিন হল এ পথে সে হাঁটেনি, বাবুপাড়ার পথ তাদের মত হাভাতীদের জন্য

নয়, বাবুপাড়ার পথ ঠাকুর দেখা আর মহোৎসব খাওয়ার পথ। ভাসানীর মনে পড়ে সে যখন ছোট্ট ছিল, আবছা জ্ঞান পড়েছে তখন এই চওড়া পথ ধরে বাপের সাথে অরন্ধন ষষ্ঠীর বাসি ভাত মাঙতে এসেছে কতবার। এখনও তাদের পাড়ার ছেলে-মেয়েরা মিছিল করার মত যায়, কিন্তু সে তাদের সাথী হতে পারে না যেহেতু তার দু-চোখের কোনে রাজ্যের লজ্জা-সংকোচ এসে বাসা বেঁধেছে, তাকে বড় আত্মসচেতন আর ঘরকুনো করে তুলেছে। যে বয়সের যা ধর্ম, ভাসানী তার মায়ের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও থালা বা ডেকচি হাতে এখন আর বাবুদের দোরে দোরে বাসি ভাত ভিখ মাঙতে যেতে পারে না। এক অপরিসীম লজ্জায়, অনতিক্রম্য সংকোচে সে যেন চিররুগ্ন বালিকার মত দুস্থ হয়ে পড়ে মনে মনে।

জলাভুঁই পেরিয়ে এলেই কাঁচা পথ, এখন জলকাদায় সেই পথ পিছল, একটু অসাবধানে হাঁটলেই পা হড়কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। যদিও ধারে কাছে কেউ নেই তবু পড়ে গেলে যদি ব্যথা লাগে, যদি তার কর্মক্ষম শরীরটা অকেজো হয়ে পড়ে শুধু এই ভয়ে ভাসানী পা টিপে টিপে লাজুক গতিতে হাঁটে। তার দু'হাতের আঁকশিলতায় ধরা আছে তারই বহু যত্ন আর অধ্যাবসায়ের ফসল অনবদ্য একটা নকশি কাঁথা যা কিনা ভাসানীর মন-প্রাণ উজাড় করে বানানো। এই নকশি কাঁথাটা তার মায়েরও পছন্দ, তাই আসার সময় বার বার করে শোভবুড়ি বলেছিল, যাসনিরে ভাসানী, এ কাঁথার দাম তুই কারোর কাছে পাবিনা। সনসারটা বড় কঠিন জায়গা, এখানে চোখের জলে মাটি ভেজে না! মাটি ভেজে বানের জলে। মায়ের কথাগুলো ভাসানীকে সূচীভেদ্য অমাবস্যা রাত্রির দিকে ঠেলে দেয়, যেখানে সে একটা অন্ধ রাতপোকার মত এক নাগাড়ে এলোমেলো উড়ে উড়ে হাঁপিয়ে উঠে, বিষণ্ণ দু'চোখ মেলে গিলতে থাকে অন্ধকার।

ক্ষুদিরাম পাগল হবার পর থেকেই সংসারের দায়-দায়িত্ব ভাসানীর ঘাড়ে জোর করে কে যেন জোয়াল চাপানোর মত চাপিয়ে দেয়। ভাসানী মেয়ে, তার সীমিত ক্ষমতায় একার পেটই বহন করা দুঃসাধ্য—তার উপরে আর দু-জনের ভরণ-পোষন তাকে আরো নুব্জ করে দেয়। আগে সে বিলমাঠ থেকে কলমী শাক তুলে হাটবারে হাটবারে বসত, কিন্তু জলঢোড়া সাপটার তাড়া খাওয়ার পর থেকে সে আর ভয়ে বিলমুখো যায় না।

শোভাবুড়ির কাঁথা সেলাইয়ের হাতটা খাসা, অতিরিক্ত ধৈর্য দিয়ে পুরনো কাপড়ে সূচ-সুতোর সঙ্গম ঘটিয়ে সে যে শিল্পমণ্ডিত কাঁথা বানাত তা চোখ ভরে দেখার মত। ভাসানী মনোযোগ দিয়ে দেখতো সেলাই-ফোঁড়াই—

পাড়ের সুতো দিয়ে তার মা যা সৃষ্টি করেছে তা অসাধারণ শিল্প ছাড়া আর কিছু নয়।

কাঁথার কাজ ধৈর্যের কাজ, সে কাজে ফাঁকি দিলে মানুষের মন পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়: শোভাবুড়ি দোক্তাপান চিবিয়ে হাসতে হাসতে বলত, বুঝলিরে মা, সুচে তাগা পরাতে গেলে ধৈর্য থাকা চাই। ধৈর্য বিনা এ সংসারে কোন কাজটা ভাল মতন হয়? তুই যা করতে চাস তা আগে মনে মনে ভেবে নে। হাতে সুচ সুতো থাকলে মন ছটফটালে ফুল-লতা-পাতা কাপড়ের গায়ে জীবন্ত হয়ে ধরা দেবেনি। গাছে ফুল যেমন হাসে, সুতোর ফুল তেমন হাসলে সেলাই-ফোঁড়াই সার্থক হয়। না হলে বেগার খাটা। তার চাইতে হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ঢের ভালো।

মায়ের কথাগুলো বেদবাক্য; ভাসানী অগ্রাহ্য করতে পারেনা। চোখের জ্যোতি কম হবার পর থেকেই শোভাবুড়ি কাঁথাকানি নিয়ে বসতে আর সাহস পায় না, একটু খর চোখে তাকালেই দু'চোখ জলে ভরে ঝাপসা হয়ে যায় দৃষ্টি। তখন কোথাকার সুতো-সেলাই কোথায় গিয়ে ঠেকে, কাঁপা হাত আরো থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে অক্ষমতায়। বয়স বাড়লে শুধু চোখ নয়, শরীরের সব কিছুই শিথিল হয়, গাভীন মেঘ যেমন জলকণাকে ধরে রাখতে পারে না, তেমনি চোখের জলও ঝরে পড়ে, অনুভূতিময় স্নায়ুগুলোকে হারিয়ে দিয়ে। মায়ের কথা ভেবে-ভেবে ভাসানীর পথ চলা শিথিল হয়ে পড়ে, ঠোঁট কামড়ে অন্যমনস্ক চোখে সে আকাশ দেখে। দাদার উপর তার অভিমান জম্মায়। সংসারে যার ছাতা ধরার কথা ছিল, সে নিজের মাথা থেকে ছাতা সরিয়ে নিয়ে বদ্ধ উম্মাদ হয়ে গেল। খরানীকালে অথবা শরৎ-এর মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশেও সে অসুর হয়ে ওঠে। তখন তার মুখে কথার তুবড়ি। গানের ফুলঝুরি। ঐ মানুষটা যদি রেগে যায় তাহলে খিস্তি খেউড়ের বান ডেকে দেয়। ভাসানী কিছুতেই বুঝতে পারে না তার দাদার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ কি? পশুপতি হাজরা তার বাবা। দুরারোগ্য রোগে ভুগছিল অনেকদিন থেকে, কঙ্কাল শরীরটা তার বিছানায় লেগে গিয়েছিল ছ-মাসের উপর। মরার সময় লাটু ময়রার পানতুয়া খেতে চেয়েছিল রসনা তৃপ্ত করে! অনুজ্জ্বল, শোককাতর, ক্ষয়িষ্ণু চোখ তুলে আর্তিমাখা গলায় বলেছিল, ক্ষুদে রে, পানতুয়া খেতে খু-উ ব মন চায়। কৎদিন হলো টক-মিষ্টি-ঝাল কোন কিছুই চেখে দেখিনি! অথচ, খেতে আমার খু-উ-ব লোভ হয়। কথাগুলো বলেই পশুপতি ভিখারী চোখে তাকিয়ে ছিল যুবক ক্ষুদিরামের দিকে। ক্ষুদিরামের তখন বিড়ি খাওয়ার পয়সা নেই, চুল দাড়ি কাটারও পয়সা নেই, তবু সে পশুপতির কথা রাখতে ছুটে গিয়ে ছিল লাটু ময়রার দোকানে। লাটু ময়রা তার কথা কানে তোলেনি,

উপহাস করে বলেছে, যা রাঙাবাবুর কাছে যা—নিজেকে বন্ধক রেখে টাকা আন। মিষ্টি আমি ধারে বেচি না। ছানা-দুধ সব আক্কারা। শুধু হাত শুকলে তো মিষ্টি পাওয়া যায় না। কথাটা হাড়ে গিয়ে খোঁচা মেরেছিল ক্ষুদিরামের, পশুপতির আর্তি মাখানো চোখদুটো হিম করে দিয়েছিল তার ফুটন্ত রক্ত। খালি হাতে টাকা দেয়নি রাঙাবাবু, তাই শোভাবুড়ির সখের জামবাটিটা বন্ধক রেখে ছিল ক্ষুদিরাম। পানতুয়া নিয়ে ফিরে আসতে বেশি সময় লাগেনি অথচ ফিরে এসে দেখল মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে তার বাবা, হাতের মুঠি পাকানো বিস্ফারিত কালো ভেঁটুল চোখে-মুখে পরিব্যপ্ত ঘৃণা আর বিক্ষোভ। ঐ নিথর, হিম অসাড় মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে মাথার চুল বন্য উন্মাদনায় চেপে ধরে কেঁদে কঁকিয়ে উঠেছিল ক্ষুদিরাম, তারপর সে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। ভাসানীর স্পষ্ট মনে আছে, ক্ষুদিরামকে সে বাধা দিয়েও আটকে রাখতে পারেনি। গাঁয়ের বুড়ো অশত্থ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম বুক চাপড়ে উন্মাদস্বরে কাঁদছিল, বাপ আমার পানতুয়া খেতে চেয়েছিল গো, তোমাদের ঐ লাটু ময়রা তাকে পানতুয়া খেতে দিলোনি। টাকা ছিলোনি, টাকা থাকলে বাপরে আমি পেট পুরে পানতুয়া খাওয়াতাম। হা, তোমরা সব দেখবে চলো, আমার বাপের চোখদুটো দরকচা মারা পানতুয়ার মত দড়ো হয়ে আচে! তার চোখে কত্তো ক্ষিদে। আমি কুলাঙ্গার গো, তাই ক্ষিদে মিটাতে পারলাম না।…তোমরা ছুটে আসো গো,…ছুটে এসে আমার বুকে লাথ মারো। লাথ মেরে মেরে আমার হাড়-পাঁজরা সব পাকাটির মতন ভেঙ্গে দাও। আমি আর এ জীবন ধরে রাখবনি।…হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারত-বাসী। আমি সেই ক্ষুদে…ক্ষুদিরাম গো…একবার বিদায় দাও গো পুরো গাঁখানা ঘুরে আসি।

বাসি মড়া পড়ে রইল ঘরে, ক্ষুদিরামের পাত্তা নেই। গাঁ ঘুরে কেউ তার আর দেখা পেল না। হাজরাপাড়ার সবাই চাঁদা তুলে ঘাটকাজ সারল পশুপতির। সেদিন থেকেই ভাসানীর দুঃখ শুরু, ধারাবাহিক বৃষ্টিপাতের মতন সেই চরম পরম, অনতিক্রম্য দুঃখ তাকে ভিজিয়ে দেয় সব সময়, সে কাঁদে… নিজের পোড়া অদৃষ্টের জন্য ভুকরে ভুকরে কাঁদে।

ফাঁকা বিলে মাছ ঘাই দেয়। পানকৌড়ি আর শামুকভাঙা পাখি ধূর্ত চিলের মত ছায়া ফেলে চক্কর কাটে আকাশে। হা করে সে দিকেই তাকিয়ে থাকে ভাসানী, বুকের খোদলে খলবল করে হাওয়া, শরীর রোমাঞ্চিত হয় সেই মাঠ পালানো হাওয়ায়। বাপের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারিনি দাদা। টানা বর্ষায় পৃথিবী ভিজে কাকভেজা। যেটুকু রোদ ওঠে তা যথেষ্ট নয় মানুষকে তেজালো রাখার জন্য। কাল ঘরের বাইরে এসে হাঁটু মুড়ে বসেছিল তার মা।

কঙ্কাল শরীর, কোঠরাগত চোখ। হাত-পা কাঠি কাঠি। ন্যাতানো বুকের হাড়খাঁচাটা স্পষ্ট। এই মাকে দেখে কান্নায় চোখ জুড়ে এসেছিল ভাসানীর। সে তখন খেজুর পাতার মাদুর বিছিয়ে কাঁথা সেলাই করছে মোড়ল গিন্নির, কাঁথাটা শেষ হলে সে পাবে দশ টাকা। তাই হাত চলছিল মেসিনের মত। দুধ কেঁচোর মত সাদা সুতোর ফোঁড় উঠে যাচ্ছিল কাপড়ের গায়ে এঁকে বেঁকে। কঠিন ধৈর্য আর নিরলস অধ্যবসায়ে তৈরী হচ্ছিল ফুল-লতা-পাতা-লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। নিজের সৃষ্টিকে সে নিজেই চিনতে পারছিল না। অথচ পেটে এক ফোঁটা মাড় ভাতের চিহ্ন নেই, শুধু পোয়াটেক আটা কিনে এনে তারা মা-বিটিতে ফুটিয়ে খেয়েছে। সেই আটা ঘ্যাঁট খেয়ে আবার পেট ছেড়েছে শোভাবুড়ির। মোড়ল গিন্নি কাঁথা সেলাইয়ের দশটা টাকা দিল না, এক পালি ক্ষুদ দিয়ে বলল, যা ভাসানী, এখন তোর টাকাটা দিতে পারলাম না। চাষ কাজে নগদ টাকা সব কর্পূরের মত উড়ে গেছে! এখন গেরস্তের হাত ফাঁকা। ধান উঠলে তোর টাকা আমি মনে করে পাঠিয়ে দেব।

দশটা টাকার বড় দরকার ছিল ভাসানীর, তবু সে মুখ ফুটে মোড়লগিন্নিকে টাকার কথা বলতে পারেনি। টানা জ্বরে ভুগে তার মা ক'দিন থেকে একটু ঝরঝরে, ফাঁক পেলে শুধু বলে, ভাসানীরে, ক'দিন হলো ভাত খাইনি। কাঁচ-কলা দিয়ে মাগুর মাছের ঝোল খেতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

কথা শুনে ভাসানী অসহায় চোখে তাকিয়েছে, মরমে মরে গিয়েছে সে। জ্বর জ্বালা থেকে উঠলে খাওয়ার নোলা বাড়ে সবার। মায়ের কি দোষ? না খেতে পেয়ে আতভুড়ি তার শুকিয়ে গেল। অথচ ভাসানীর আঁচল শূন্য, হাত শূন্য। চাল, কাঁচকলা, মাগুর মাছ এসব যেন তার কাছে স্বপ্ন। এই দুঃসময়ে তার দাদা যদি ফিরে আসত তাহলে ছিপগাছ দিয়ে পাঠাতো বিলে মাছ ধরতে। ভাবনাগুলো ক্রমশ ঘোঁট পাকিয়ে যেতে থাকে, নিজেকে তখন সে বড় দুর্বল মনে করে। তার এই অক্ষম অসহায়ত্বকে ঠেকা দেবার মত কেউ নেই, এত বড় পৃথিবীতে সে নিজেকে খুব অসহায় মনে করে তখন। দাদার প্রতি প্রগাঢ় অভিমানে তার লাল কৈফুল ঠোঁট কেঁপে ওঠে থরথর, শ্রাবণের আহ্লাদী মেঘের মত জলকণা জমে ওঠে চোখের সংবেদনশীল আকাশে। একটা অদম্য জেদ তাকে যেন রাহুর মত গ্রাস করে। কৈফুল ঠোঁট শক্ত করে সে ভাবে—বাপের শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি, অসীম খেদ নিয়ে পরলোক যাত্রা করেছে তার বাবা—এই দুঃখবোধ কি কোনদিন তার হৃদয় থেকে অপসারিত হবে, কোনদিন কি সে ভুলতে পারবে এই নিগূঢ় অক্ষমতার কথা! যতই ভোলার চেষ্টা করে, ততই যেন আঁকশিলতার মত পেঁচিয়ে ধরে তাকে, তখন ভাসানীর শ্বাস কষ্ট শুরু হয়,

মনের ভেতর উথাল-পাথাল অক্ষমতার ঝড় শুরু হয়, কাঁথায় সুঁচের চিহ্ন আঁকতে গিয়ে নরম আঙ্গুলে সুঁচ ঢুকিয়ে ডুকরে কাতরে ওঠে অতর্কিতে।
শোভাবুড়ি ম্রিয়মান স্বরে শুধায়, কি—হলো রে মা ?
রক্ত চুঁয়ানো তর্জনীটা শাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে মলিন হাসে ভাসানী, কিছু হয়নি মা। এমনি গলা থেকে একটা স্বর বেরিয়ে এলো।
—সুঁচ ফুঁড়েছে বুঝি ? কৈ, আয়তো দেখি—
ভাসানী তবু যেতে পারে না, আড়ষ্ট শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পলকহীন চোখে সে তার বুড়ি মাকে দেখে।

অভিজ্ঞ শোভাবুড়ি তখন টানা টানা গলায়, অস্পষ্ট উচ্চারণে ঠোঁট কাঁপায়, কাঁথা সেলাইয়ের কাজ তাড়াহুড়োর কাজ নয় মা। এসব কাজে মন আর চোখ হলো আসল জিনিস। এ দুইয়ের একটা গড়বড় হলেই বিপদ ঘটে। কথা শেষ করে সে তার দীর্ঘদিনের কাঁথা সেলাইয়ের ক্ষত-বিক্ষত, ফাটা ফাটা, চামড়া ওঠা হাতটা বাঘহাতা ঘাসের মত মেলে ধরে মেয়ের সামনে, হা দেখ, আমার হাত দুটোর কি দশা হয়েছে ! এই হাত দিয়ে জীবনে কত কাঁথা না সেলাই করলাম। কত ফুল-লতা-পাতা পেরজাপতি সুঁচের আগায় জান-প্রাণ দিয়ে এঁকে গেলাম। কিন্তু পাওনা যা পাওয়ার তা আমি পাইনি। গাঁয়ে ঘরে কেউ এর দাম দিতে জানে না। সবাই বলে—বা:, ভাল হয়েছে তো ! কিন্তু কেউ আর মনের মত পয়সা দেয় না। পয়সার বেলা বড় সবাই শেয়ানারে।

মায়ের যা আফসোস, দীর্ঘশ্বাস, যোগ্য সমাদর না পাওয়ার খেদোক্তি ভাসানীর হৃদয়েও ধ্বনিত হয়, এক নিঃসীম শূন্যতায় তার বুকের বাগান ভরে যায়। মায়ের কথাগুলো সে শুধু ভাবে। সে ক্রমশ ভীত হয়ে পড়ে তার ভবিষ্যৎ চিন্তায়। ক্ষুদ্র এই শিল্পকে ধরে এতবড় সমস্যা বহুল জীবনকে সে কি বয়ে নিয়ে যেতে পারবে ? কাঁথার কাজে যে শ্রম যায়, সেই শ্রমের মূল্য তো সে কোনদিন ফেরত পায় না। শুধু শুকনো প্রশংসায় জীবন বাঁচে না। জীবনকে বাঁচাতে গেলে রসদের প্রয়োজন। কে দেবে তাকে জীবনধারণের উপযুক্ত উপকরণ।

হাঁটার গতি শ্লথ হয় ভাসানীর, কেমন আচ্ছন্ন চোখে সে তার বুকের কাছে আলতো ভাবে ধরে থাকা নকশি কাঁথাটার দিকে পরম স্নেহের চোখে তাকায়। ভাঁজ করা কাঁথাটাকে একটা অবোধ শিশুর মতন মনেহয় তার। কি নরম, আদুরে, মিষ্টি মিষ্টি ! কাঁথার ভেতর থেকে শিশুর ভালবাসা যেন বিচ্ছুরিত হয়, আর সেই মনোমুগ্ধকর ভালবাসার ছোঁয়ায় মাখা-সন্দেশের চেয়েও নরম আর অনুভূতি প্রবন হয়ে পড়ে ভাসানীর চিন্তাচ্ছন্ন ক্ষুধার্ত মনটা। প্রলম্বিত ডাগর ঘুঘু নরম দুই বুকের মাঝখানে কাঁথাটাকে চেপে ধরে এক উষ্ণতাময় সুখ

অনুভব করার চেষ্টা করে সে। তার কুমারী যৌবন অতৃপ্ত মাতৃত্বের আহ্বানে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কাঁথার প্রতিটি সেলাই যেন শিরা-উপশিরার মত ছড়িয়ে আছে, লাল…নীল…সবুজ কত রকমের শিরা-উপশিরার বিন্যাস। হুবহু মানবদেহের মত রক্তের যে চিরকালীন উষ্ণতা তাকে সে অস্বীকার করবে কি করে? কত যত্ন আর ভালবাসায় গড়ে উঠেছে এই নকশি কাঁথা, কত দিনের অবিচ্ছেদ্য শ্রম এবং ঘাম মিশে আছে এই শিল্প সুষমায়। তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে তিলোত্তমা করে তুলেছে এই নকশি কাঁথা। তার ইচ্ছে ছিল শত অভাবে, শত টানাটানিতেও সে তার এই শিল্পকে কোনদিন কারোর কাছে, কোন শর্তে বিকিয়ে দেবে না। এ তো একটা সামান্য কাঁথা নয়, এ যেন তার নিজের সুষমা মণ্ডিত দেহ পল্লবী। কুসুম নরম কিংবা পলিমাটি কমনীয় তার রক্ত মাংসের লোভনীয় শরীরটা। ভাসানীর অনুভূত হয়—সে যেন নিজেকেই সওদার মত টেনে নিয়ে যাচ্ছে রাঙাবাবুর দুয়ারে, শিল্প শোভিত নকশি কাঁথা নয়—সে নিজেই যাচ্ছে নিজেকে বন্ধক দিতে।

আসার সময় বারবার নিষেধ করে শোভাবুড়ি, কোথায় যাবিরে মা, কাঁথাটা নিয়ে!

কোন জবাব দেয়নি ভাসানী, শুধু আয়ত জল ছলছলে চোখ মেলে তাকিয়েছিল মায়ের শুকনো মুখের দিকে। শোভাবুড়ি বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল টলতে টলতে। ভাসানীর হাতে ভাঁজ করা কাঁথাটা দেখে সে কাতরে ওঠা স্বরে বলেছিল, খবরদার, এ কাঁথা তুই নিয়ে যাবিনে। এত সুন্দর কাজ করা কাঁথা এ গাঁয়ে আর দু'টি নেই। রেখে দে মা, রেখে দে। অভাবী পেট ঠিক চলে যাবে। পেটের গর্ত ভরানোর জন্য অতবড় সর্বনাশ তুই করিস নে। কোন কথা শোনেনি ভাসানী, যত্নে ভাঁজ করা কাঁথাটা বুকের কাছে তুলে ধরে সে শুধু এক পলক তার মাকে দেখেছিল, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল ঘর থেকে। শোভাবুড়ি পথ আগলে দাঁড়াল জোর করে ছানা কেড়ে নেওয়া পাখির মায়ের মত, ধুঁকো, ক্লান্ত, বিবশ স্বরে বলেছিল, কাঁথাটা রেখে দে মা। সারাজীবন কাঁথা সেলাই করেচি কিন্তু অমন কাঁথা কি একটা করতে পেরেচি! আমি যা পেরেচি তার হাজার গুণ ভাল এটা। এটা তোর জীবনের সেরা ফসল। তাকে তুই অন্যের হাতে তুলে দিবি? নিজেকে বেচে দিয়ে কোন মানুষটা সুখ পায়রে…

—আমি সুখ চাইনে মা। আমি চাই, তুমি শুধু সুখী হও। চোখের সামনে বাপ আমার ধড়ফড়িয়ে মরল। দাদা তারে দুটো পানতুয়া দিতে পারেনি। এই দুঃখ আমার বুকেও বাজে, আমাকে কুরে কুরে খায় অষ্টপ্রহর। দাদার মত আমি পারবোনি মা। আমি জিতব, যে করেই হোক জিতব।

—তা বলে নিজের সখ-আহ্লাদ, ভাব-ভালবাসার জিনিস বিকিয়ে দিয়ে? অমন নকশি কাঁথা তুই কি আর সেলাতে পারবি? কুমোররা প্রতিমা গড়ে—সব প্রতিমা কি সমান হয়রে! তুই যা গড়েছিস তা আর জীবনভর চেষ্টা করলে গড়তে পারবিনে। ওটা তুই রেখে দে, দোহাই তোকে—

কিন্তু জেদে টইটুম্বুর ভাসানী মায়ের কোন কথাই কানে তোলে না। পর পর তিনদিন কোন মানুষটা জাউভাত আর আটা সিজা খেয়ে থাকে? এই পচা বর্ষার মাসে মুচিপাড়ার মানুষগুলো ঢাক-ঢোল বন্ধক দিয়ে টাকা আনে রাঙাবাবুর কাছ থেকে। রাঙাবাবু এই পৃথিবীর গরীব মানুষদের বিশ্বাস করে না। খালি হাতে তার কাছে একটা ফুটো আধলাও পাওয়া যাবে না। ঘরে ঘটি-বাটি নেই যে বন্ধক দিয়ে টাকা আনবে ভাসানী। মা জ্বর থেকে উঠেছে, তার তো উপযুক্ত পথ্যের প্রয়োজন। প্রয়োজনে সখের জিনিস, স্বপ্নের জিনিস বিকিয়ে দিতে ভাসানীর কোন সংকোচ নেই। মা তার কাছে জগতের সব চাইতে মূল্যবান মহিয়সী দেবী। তার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য নকশি কাঁথা কেন—সে নিজেকেই বিকিয়ে দিতে পারে নির্দ্বিধায়।

পথের ধারের ধুলো কাদা মাটিতে লাল কেঁচোর ঘর, ঢোড়া কেঁচোগুলো জল গায়ে পথের উপর কিলবিল করছে, লালায় ভরে উঠেছে কেঁচোর কুণ্ডলী। এই কেঁচোগুলোর টোপ মাগুর মাছে খুব খায়। ভাসানী সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে, বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নির্জন পথে। বেলা কত হল কে জানে! আকাশের যা গোমড়া মুখ—তাতে যে কোন সময় হুড়হুড়িয়ে বৃষ্টি ঢালবে। ফেরার পথে আল ডুবে যাবে জলে। আর আলিঘাসের ভেতর দিয়ে শরীরে রূপোর দ্যুতি খেলিয়ে ডরপুক বুকে সাঁতরে যাবে ঘুঁটেল পুঁটি। যার চোখগুলো অবিকল রাঙাবাবুর চোখের মত। যার গায়ের রঙ হোগলা পুঁটির মত, স্বভাব তেতো পুঁটির চেয়েও নক্কারজনক। সেই মানুষটার কাছে উজিয়ে যাচ্ছে ভাসানী। ভয় তো হবেই। তাই সে কিছুটা সরপুঁটির মত চেহারা নিয়ে কুঁকড়ে আছে। মায়ের কথাগুলো মনে পড়ছে বারবার। আর ভয়ের হিমস্রোতটা দুধ কেঁচোর মত উঠে আসছে মনের ভেতর। কিলবিলিয়ে উঠছে ঘৃণা। তবু ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে। রাঙাবাবু টাকা দিলে বাজার থেকে মাগুর মাছ, কাঁচকলা আর লগুধানের চাল কিনে যাবে সে! তারপর, নিজের হাতে যত্ন করে রাঁধবে। মাকে খাওয়াবে পাশে বসিয়ে। এমন সুখের মুহূর্তে তার দাদা যদি ফিরে আসত, তা হলে একেবারে সোনায় সোহাগা হত দৃশ্য পট।

নকশি কাঁথার দুঃখ ভাসানীর মনে আর দুঃখ সন্তাপের তাঁবু বিছাতে পারে.

না। ক্রমশ এইসব মন খারাপের বিষয় গুলোকে ভুলে সে দুধকলমা ধানগাছের মত সজীব, সতেজ হয়ে উঠছে ভেতরে ভেতরে।

রাঙাবাবুর দোতলা বাড়িটা হলদে রঙের, অবেলার রোদ সেই রঙকে আরো গাঢ় করেছে, তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না! ভাসানী বুকের খোদল থেকে নিঃশ্বাস টেনে হাপুস নয়নে তাকাল। এতবড় সুসজ্জিত, চোখকাড়া পাকাবাড়ি এ গাঁয়ে আর দ্বিতীয়টি নেই। নিন্দুকেরা বলে, বাড়ি নয়তো যম-পুরী। এর প্রতিটি ইটে অভিশাপ জড়িয়ে আছে। রাঙাবাবু মরলে এই পাকাবাড়িতে বট-অশোথের চারা গজাবে। সেদিন ঝরে ঝরে পড়বে ইট বালি সিমেণ্ট। সেদিনের আর বেশি বাকি নেই।

শকুনের শাপে গোরু মরে না। মনে মনে হাসল ভাসানী। এত শক্ত ভিতের মজবুত পাকা বাড়িতে সহসা কেন ফাটল ধরবে, কেন মুখ থুবড়ে পড়বে মাটিতে? রাঙাবাবু তাঁর সব কিছু দিয়ে আগলে রাখবে স্বপ্নের ইমারত। ধনবান মানুষের স্বপ্ন তো মাকড়সার জাল নয় যে ফুঃ দিলেই দুলে উঠবে, ছিঁড়ে যাবে! ভাসানীর পায়ের তলায় ভেজামাটি, সেই সিক্ত মাটিতে সে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, রাঙাবাবু যদি তার কাঁথাটা বন্ধক না রাখে তা হলে সে কার কাছে দাঁড়াবে। কিন্তু কোন বিকল্প পথই সে খুঁজে পেল না! এ গাঁয়ে অসময়ে টাকা হাওলাত দেবার মত কোন লোক নেই। তাই রাঙাবাবুর উঠোনে পা দেওয়ার আগেই মনেমনে বার সাতেক সে মা কালীর নাম জপে নিল, তারপর সাহসে বুক বেঁধে উঠে এল শান বাঁধান দাওয়ায়।

তাকে দেখতে পেয়ে কোষ্ঠ কাঠিন্যের মত কদর্য মুখ করে এগিয়ে এলেন রাঙাবাব, কি ব্যাপার? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই তিনি ভাসানীর স্পর্ধিত, যৌবন প্রস্ফুটিত বুকের দিকে লালসার চোখে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টি অবিকল ঘুঁটেল পুঁটির দৃষ্টি। ভাসানী ভয়ে কুঁকড়ে গেলেও, সপ্রতিভ চোখে তাকাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পুরুষ চোখ কাঁথা সেলাইয়ের তীক্ষ্ণ সুঁচ হয়ে বিঁধতে থাকে তার সর্বসত্ত্বায়। বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যায় সহসা। ঢোক গিলে কোনমতে সে বলে—বাবু, আপনার কাচে এয়েচিলাম।

—বলে ফেল কি দরকার। আমার কাছে তো কেউ বিপদে না পড়লে আসে না।

ভাসানী ঘেমো গলায় বলে—হ্যাঁ বাবু, আমার খুব বিপদ। মা জ্বর থেকে উঠেচে। ঘরে পথ্য নেই। তাই···

রাঙাবাবু চোখ কুঁচকে তাকালেন, কাছে সরে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ভাসানীকে, তারপর হুলো বাঘের মত 'হুম্' শব্দ করে আড়মোড়া ভেঙে বললেন তুই কার বিটি, তোর বাপের নাম কি? আমি তোকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

ভাসানীর ফাঁপড়ে পড়া চোখ, হাড়িকাঠে গলা দেওয়া মানুষের গলায় সে বলল, আজ্ঞে আমার বাপের নাম পশুপতি হাজরা। সেই যে বছর বান হল, সেই বছরই আমার বাপ মরল। আপনি তাকে পোড়ানোর জন্য পাঁচটাকা দিয়েছিলেন!

—ওঃ, তুই পশুপতির বেটি! বাঃ ভাল, ভাল! তা বল, কিসের জন্য এসেচিস?

ভাসানী কাচুমাচু চোখে তাকাল, দশটা টাকা আমার খুব দরকার বাবু—যদি উধার দিতেন!

—কেন, এবার কি মা মরল তোর? চিবিয়ে চিবিয়ে হাসলেন রাঙাবাবু। ভাসানীর চোখের মণিদীপে একটা ঘুঁটেল পুঁটি যেন ছড়ছড়িয়ে সাঁতরে চলে গেল। তার দাদা বলত, ঘুঁটেল পুঁটি বড় চালাক রে বুন। ওরা টোপ খায় না, টোপের কাছে কাছে ঘোরে। সুযোগ বুঝে টোপ ঠুকরে চলে যায়। ওরা জলে থাকে কিন্তু জলের কোন মাছের সাথে মেশে না। ওরা সাদা হয়, পাখড়া হয়। ওরা হারামী হয়, খচ্চড় হয়। ওরা কানা হয়, তেতো হয়। ওরা বিষ হয়, বজ্জ হয়…। ওদের আঁশগুলো ওদের মনের মতন ছোট ছোট। ওরা গু-গোবর সব খায়, ওদের কোন বাছ-বিচার নেই। বড় রাক্ষুসী মাছ বুন, ওদের থেকে শত হাত তফাৎ-এ থাকবি। রাঙাবাবুর ঘাম চকচকে লোভী মুখের দিকে তাকিয়ে ভাসানী অনুনয়ের স্বরে বলে, বাবুগো, খুব ঠেকায় পড়ে এসেছি। বুড়ি মা আমার মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবে বলেচে। ঘরে কিছু নেই। তাই আপনার কাচে ছুটে এলাম।

—এসেছিস, ভালো করেছিস। কিন্তু, আমি তো কাউকে টাকা উধার দিইনে। তোকে টাকা দিলে তুই ঘুরোন দিবি কি করে? তোর কি সেই ক্ষমতা আছে?

মহা ফাঁপড়ে পড়ে ভাসানী বলল, উধার আমি চুকিয়ে দেব বাবু। সব অভাবী মানুষ অসৎ হয় না। মা ভালো হয়ে গেলে কাঁথা সিলিয়ে আপনার টাকা আমি ফেরৎ দেব। এখন বড় হাত টানাটানি। এই কটা দিন আপনি আমাদের বাঁচান।

—শুধু হাতে কি টাকা দেওয়া যায়রে ক্ষেপি! তোর মুখের কথাকে কি বিশ্বাস? রাঙাবাবু সহসা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ভাসানীর জড়োসড়ো গতরের দিকে, বাহারী কাঁথাটা নজরে পড়তেই ব্যস্ত হয়ে শুধোন, তোর হাতে ওটা কিরে? দেখি, দেখি?

—একটা কাঁথা। একমাস ধরে সিলেচি। কাঁথাটা সাট-পাট করে মেলে ধরে ভাসানী, তখনি অদ্ভুত একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চরাচরে। রাঙাবাবু

কাঁথাটা উল্টে-পাল্টে দেখেন, মনে মনে খুশিও হন। সেই খুশির অভিব্যক্তি ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সারা মুখে। প্রসন্ন গলায় হিসেবী বণিকের মত বলেন, বাঃ, ভারি সুন্দর তো কাঁথাটা! কে করেছে?

—আমি বাবু। ভাসানীর দু-ঠোঁটে চকচকে গর্বের হাসি, পুরো একমাস লেগেচে বাবু। রাত-দিন জেগে করেচি! ভেবেচিলাম—ঘরে রাখব। নিজে গায়ে দেব শীতে। কিন্তু—

—কিন্তু কি-রে?

—গরীবের সখ-আহ্লাদ থাকতে নেই বাবু। কাঁথাটা আমি বেচে দিব। আপনি নেবেন?

—দাম কত?

দামের কথা এর আগে কোনদিন ভাবেনি ভাসানী। সমস্যার অতলে তলিয়ে যাওয়া চোখ-মুখ করে সে রাঙাবাবুর মুখের দিকে তাকাল, তারপর বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, যা হোক দেবেন। আপনার কাচে দরদাম কি করতে পারি!

মাত্র পঁচিশ টাকার নকশি কাঁথাটা বেচে ঘরে ফিরে আসে ভাসানী, ফেরার পথে তার অন্তরাত্মা হু-হু করে কেঁদে ওঠে। এক মাসের নিরলস শ্রমের মূল্য মাত্র পঁচিশ টাকা! তবু ঐ টাকা গুলো তাকে যেন অনেক শক্তি জুগায়। বাজার-হাট সেরে সে যখন ঘরে ঢোকে তখন ঐ নকশি কাঁথা নিয়ে তার মনে কোন দুশ্চিন্তা নেই। ভগবান দিন দিলে, অমন আর একটা কাঁথা সে আবার বানিয়ে নিতে পারবে।

মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছিল শোভাবুড়ি। খেতে খেতে সে বলল, কাঁথাটা শেষ পর্যন্ত বেচে দিলি মা! কেন, বাঁধা দিয়ে কটা টাকা আনলেই তো পারতিস। সুদিন আসলে কাঁথাটা ফের ছাড়িয়ে আনতাম। অমন সোন্দর একটা কাঁথা—

ভাসানী ভাতের দলাটা গিলে নিয়ে মন কেমন করা চোখে তাকাল, তা হয় না মা। বাবুর বৌয়ের কাঁথাটা খু-উ-ব পছোন্দ! তারা তাই বন্ধক রাখবে না। একেবারেই কিনেই নিল!

—এত কম দামে দিলি কেনে? একটা নক্‌শি কাঁথার দাম কি পঁচিশ টাকা? আজকাল তো পঁচিশ টাকায় একটা খেজুর পাতার মাদুরও পাওয়া যায় না!

ভাসানী খাওয়া থামিয়ে তীরবিদ্ধ পাখির চোখে তাকাল, তারপর ভেজা স্বরে বলল, বাবু প্রথমে দাম দিয়েছিলেন পাঁচটাকা। আমি বহু কষ্টে তা পঁচিশ টাকা অব্দি তুলেচি। তাছাড়া, গরজটা তো বাবুর নয়—আমার।

বিকেলে বেশ ফুটফুটে রোদ উঠেছে, শোভাবুড়ি ঘুমিয়ে ছিল দাওয়ায়। ভাসানী গিয়েছিল কচুশাক খুঁটতে বাদাড়ে। তখনই গ্রামের পঞ্চায়েত মুরলীবাবু ডাকতে-ডাকতে এলেন শোভাবুড়ির দাওয়ায়। তিনি একা আসেনি, তাঁর সঙ্গে এসেছেন আরো ক'জন ধোপ দুরস্ত বাবু চেহারার মানুষ। সভ্য ভদ্র মানুষ গুলোকে শোভাবুড়ি এই প্রথম দেখল, তাই সে চক্ষু ছানাবড়া করে তাকিয়ে ছিল ড্যালভেলিয়ে। অসময়ে এদের আগমনের হেতুটা কিছুতেই সে বুঝতে পারছিল না।

মুরলীবাবু দাওয়ায় উঠে এসে হাসতে হাসতে বললেন, তা খুড়িমা, কেমন আছো গো? অবেলায় শুয়ে আছো, শরীর কি খারাপ নাকি?

শোভাবুড়ি ব্যস্ত হয়ে একটা ছেঁড়া তালাই পেতে দিল দাওয়ায়, বিগলিত স্বরে বলল, বসেন বাবু, বসেন। এই গরীবের দুয়ারে আপনাদের শ্রীচরণের ধুলো পড়া মানে আমার জীবন ধন্য হওয়া। তা বাবু, কি মনে করে আমার দুয়ারে আসা?

মুরলীবাবু সিগ্রেট ধরালেন ধুঁয়ো ছেড়ে বললেন, একটা দরকারে এসেছিলাম তোমার কাছে। এই বাবুরা এসেছেন কলকাতা থেকে। এঁনারা টিভির লোক। তোমাদের এই নকশি কাঁথা শিল্প নিয়ে এঁনারা একটা তথ্যচিত্র করবেন। তা, তোমার কাঁথা তো এ অঞ্চলে বিখ্যাত।...তা খুড়িমা, সেই কাঁথাটা তুমি একবার বাবুদের দেখাও, যেটা তুমি পঞ্চায়েত অফিসে আমাদের দেখিয়েছিলে। আঃ, কি কাঁথা গো! অমন কাঁথা আমি জীবনে দেখিনি!

শোভাবুড়ি শূন্য চোখে তাকাল। তার মরাটে দু-চোখের কোণে ঘোলা জল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, কাঁথাটা খেয়ে ফেলেচি বাবু! দেখাতে গেলে পেট চিরে দেখাতে হয়। এই রাক্ষস পেটেই অতবড় নকশি কাঁথাটারে খেয়ে নিল। এবার বুঝুন বাবু, পেট কত বড় রাক্ষস! কোনদিন আমাদেরও গিলে নেবে।

গ্রামদর্শন

রোদে ঝলমল করছিল পৃথিবী, তখন রঙিন প্রজাপতির মত কিম্বা এক ঝাঁক টিয়াপাখির মত আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত বাস বোঝাই একদল ছাত্র-ছাত্রী নেমে এল ধানক্ষেতের পাশে পিচ রাস্তায়, সঙ্গে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দু'জন শিক্ষক। সময়টা শ্রাবণের মাঝামাঝি, মাঠ পরিপূর্ণ হিল্লোলিত সবুজ ধানে। রাস্তার দু'পাশের ডোবাগুলো জলে বোঝাই এবং প্রকৃতির আশ্চর্য নিয়মে সেখানে শাপলা আর কুঁইফুল ফুটেছে অফুরন্ত। কোথাও ঢ্যাঙাঘাস দোলা খায় আলের ধারে, কোথাও দুধা-কাঁকড়া নরম ভীতু পায়ে হেঁটে যায়। কোথাও বা বক-সারসের মিছিলে একটা একানে শামখোল ডানা ঝাপটে দূরে আকাশের দিকে উড়ে যায় আর তার প্রলম্বিত ছায়া ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে বেগবান উড়োজাহাজের মত সরে যায়।

এমন নৈসর্গিক পরিবেশ ওরা এর আগে দেখেনি। ওরা বলতে বাস বোঝাই প্রায় জনা-পঞ্চাশেক ক্লাস টেনের ছাত্র-ছাত্রী, যাদের গায়ে স্কুলের সাদা খয়েরি মাঞ্জা দেওয়া ইউনিফর্ম, পায়ে মানান সই জুতো। বস্তুত তারা মাটিতে পা দিয়েই 'হাউ ফাইন' 'বিউটিফুল,'…'ওয়াণ্ডারফুল'…'হোয়াট-এ লাভলি সিনারি' এই জাতীয় কিছু মন্তব্য করল। যেহেতু, আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া ছিল, স্ট্যাডি ট্যুরে এসে নিজেদের মধ্যে কথোপকথন ইংরেজিতেই করতে হবে। এতে নাকি স্কুলের স্ট্যাটাস, পজিশন এবং সব ছাপিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ইংরেজি বলার দক্ষতা হাজারগুণে বেড়ে যাবে যা সুশিক্ষিত ভারত গড়ার কাজে প্রভূত সাহায্য করবে। সরকারী স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মালহোত্রা সাহেব আগাগোড়া ধোপদুরস্ত, বিদ্বান, সুপণ্ডিত এবং অতি সম্প্রতি দিল্লির কোনো সেমিনারে গিয়ে, 'লাইট টু লাইট' অর্থাৎ নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে বিশাল জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছেন—যা শুনে সমবেত জ্ঞানী গুণীজন, বোদ্ধা ঝানু প্রশাসক এমন কি রাজনৈতিক নেতারাও বাহু-বাহু করে উঠেছেন! সমগ্র ভারতবর্ষের নিরক্ষর মানুষের হালফিল পরিসংখ্যান এবং অশিক্ষিত ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশার কথা তিনি যে ভাবে অন্তর দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে সহজে অনুমান করা যায়—মালহোত্রা সাহেব এই জটিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে ভাবিত। তাঁর সেই সাফল্যের জয়ধ্বজা তিনি দিল্লি থেকে ফিরে এসে, প্রেয়ারের সময় আবেগ কম্পিত কণ্ঠে, নির্ভেজাল দরদ মিশিয়ে বেশ শ্রুতিমধুর করে বলেছেন। যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আজকের এই 'আউটিং' বা 'স্ট্যাডিট্যুর'। মালহোত্রা সাহেব একটা বিষয়ের উপর জোর দিতে বলেছেন—

তা হলো, শহরের সম্ভ্রান্ত ঘরের ইংরেজি শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা ভারতবর্ষের গ্রামজীবন সম্বন্ধে যেন স্পষ্ট একটা ধারণা পায়—এবং তারা যেন জানতে শেখে বা বুঝতে শেখে, আমাদের এই সোনার দেশ, কৃষি ভিত্তিক দেশ। এই দেশের ক্রমবিকাশশীল মানদণ্ড নির্ভর করে মূলত কৃষি বিপ্লব বা কৃষি সাফল্যের উপর। এছাড়াও, ছাত্র ছাত্রীদের 'অন স্পট' শেখানো হবে—কৃষক কারা, কৃষকের কাজ কি, এবং সমাজ জীবনে কৃষকের ভূমিকা কি। পুরো গ্রাম ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের চেনান হবে বিভিন্ন জাতের গাছ, লতা-পাতা, এবং প্রয়োজন হলে তারা লতা-পাতা, কীট-পতঙ্গের নমুনা সংগ্রহ করে আনবে এবং সেগুলি উপযুক্ত সময়ে স্কুলে প্রদর্শিত হতে পারে। এতে যারা স্ট্যাডি ট্যুরে যেতে পারেনি তাদেরও গ্রাম জীবন এবং সেখানকার জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে সম্যক একটা ধারণা গড়ে উঠবে এবং ছেলে-মেয়েদের মানসিক বিকাশে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যাবে। তারপর হাতে যদি সময় থাকে, গ্রামের কোন একটি স্কুলকে বেছে নিয়ে—সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হবে। প্রয়োজনে তাদের ছবি আঁকা শেখানো হবে নয়তো সহজ সরল পদ্ধতিতে ইংরেজি পড়ানো হবে, যাতে ইংরেজি সম্বন্ধে তাদের জন্মগত ভীতি দূর হয়। এছাড়াও আছে--রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজ, জঞ্জালমুক্ত নির্মল পরিবেশের জন্য পরিশ্রম, যাতে মশার দাপট থেকে গ্রামবাসীরা কিছুটা মুক্তি পান, কেননা ইদানিং খবরের কাগজ খুললেই ম্যালেরিয়া, এনকেফ্যালাইটিস প্রভৃতি মশকবাহী রোগের প্রকোপ বাড়ছে এমন সংবাদ পাওয়া যায়। সব শেষে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে এবং সেই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রত্যেকটি স্টুডেণ্ট একজন করে মানুষকে অক্ষর পরিচয় শেখাবে, শিক্ষার আলো যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দিতে হবে।

স্কুলের বাসটা দাঁড়িয়ে থাকল পিচ রাস্তায়। আলপথ ধরে হাঁটতে থাকল ছেলে-মেয়েরা। এদের মুখে ইংরেজির খই ফুটেছে। একে অন্যকে প্রশ্ন করছে—হোয়াট ইজ দিস? কেউ উত্তর দিচ্ছে—দিস ইজ প্যাডি।

—প্যাডির সাথে ড্যাডির একটা অদ্ভুত মিল আছে! ক্লাস টেনের নয়না—যার চোখ দুটো কাজল পরা ময়নার মত, হাসতে হাসতে বলল।

—অ্যাই আস্তে বল। বেঙ্গলি ইজ নট অ্যালাউড। স্যার শুনতে পেলে ভীষণ বকা দেবে কিন্তু।

—বকুক। তা'বলে মাতৃভাষায় কথা বলবনা?

দলটা এগিয়ে চলল সারিবদ্ধ পিঁপড়ের মত, যারা ব্যস্ত ছিল চাষের কাজে, তাঁরা অপার বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকায়। বুঝতে পারে না তাদের এই

হতকুৎসিৎ গ্রামে হঠাৎ করে কাদের আগমন ! স্বভাবত তাদের চোখে সন্দেহ, উদ্বেগ। কাজ ভুলে তারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। শিক্ষক তর্জনী উঁচিয়ে ক্লাস নেওয়া কায়দায় বলেন, মাঠে যারা খালি গায়ে, খাটো ধুতি পরে কাজ করছে তাদের কৃষক বলা হয়। তারা সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে মাঠে ফসল ফলায়। সেই ফসল শহরে আসে মহাজনের মাধ্যমে। আমরা মুদিখানার দোকান থেকে চাল ডাল গম যা কিনি তা সবই ঐ কৃষকের দান। আমরা শুধু টাকা দিয়ে এই রেডিমেড জিনিসগুলো পেয়ে যাই। বুঝতে পেরেছো ? শিক্ষকের কথা শেষ হতে সবাই 'হ্যাঁ' সূচক ঘাড় নাড়ে।

কে যেন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, স্যার, কৃষকের কাজ কি শুধু কালটিভেশন করা ? ওরা কেন প্রপার এ্যাডুকেশন পায় না ?

—সবাই শিক্ষিত হলে মাঠে চাষ আবাদ কে করবে ?

—স্যার, শিক্ষা কি তাহলে সবার জন্য নয় ?

—'আরগু' ক'রনা, নয়না। উত্তেজিত শিক্ষক বলেন, তাহলে তোমার মার্কস কাটা যাবে।

নয়না নামের মেয়েটি থেমে যায়। সে বিহ্বল চোখে দেখে, তার মাথার উপর বিশাল আকাশ। যার কোন সীমারেখা নেই, সীমাবদ্ধতা নেই। আকাশ সকলের—আকাশ মানেই তো শিক্ষা।

মাঠ পেরিয়ে গ্রামে ঢোকে সকলে। এই ছোট্ট আদিবাসী গ্রামখানা সবুজে মোড়া, পাহাড়ে ঘেরা, বুনো নদীর আশীর্বাদধন্য কোন এক মহান শিল্পীর সার্থক সৃষ্টি। গ্রামের পথে এখন ধুলো নেই, পচা ড্রেনের পাঁকের চেয়েও নোংরা কাদা। সেই কাদা পথে হাঁটতে গিয়ে কিশোরপাগুলো কাদায় আটকে যায়। নয়না তার বন্ধুকে চিমটি কেটে বলে, একেবারে ফেভিকলের মত কাদা। আমার বাবা বলেন, গ্রামে না গেলে মানুষের আসল পরিচয় জানা যায় না। ভারতবর্ষকে জানতে হলে আগে গ্রামকে জানতে হবে। গ্রামের সংস্কৃতির সাথে শহরের সুস্থ সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দিতে হবে। অথচ, এদেশে তা হয় না ! উপেক্ষিত গ্রামের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে শহর গড়ে ওঠে। এই নগর সভ্যতার কোন দাম নেই ; শরীরের সমস্ত রক্ত যদি মুখে এসে জড়ো হয় তাহলে তাকে সুন্দর বলা যায় না। নয়না কথাগুলো বলে হাফ ছেড়ে বাঁচল। কিছুটা এসেই তারা শুনতে পেল অদ্ভুত মন্ত্রোচারণ। সবাই কৌতুহল নিয়ে শুধোয়, স্যার, কপালে সিঁদুরের তিলক আঁকা ঐ রোগা মানুষটা অমনভাবে উত্তেজিত হয়ে কি বলছেন ? ও'র সামনে কোলে বাচ্চা নিয়ে বসে আছেন উনিইবা কে ?

শিক্ষক পরিস্থিতি আঁচ করে নিয়ে বলেন, গুনিনে মন্ত্র পড়ছে। ঐ

বাচ্চাটার অসুখ, তাই পুজোপাঠ চলছে। ওদের ধারণা, পুজোপাঠ করলে ওষুধ না খেলেও রোগ ভাল হয়ে যায়। তাই, অত সব আয়োজন।

—সত্যিই কি তাই? শুধোয় জনৈক ছাত্র।

শিক্ষক বলেন, নোট ইট। এ সব হলো কুসংস্কার। শিক্ষার আলো আসেনি, তাই ওরা অন্ধকারে রয়ে গেছে। এ সবই হলো আদি ভারতের আসল ছবি।

ছেলে-মেয়েরা ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করে লেখে নোট বুকে। শিক্ষক অনেকক্ষণ ধরে গ্রামের মানুষের নানান সুবিধা অসুবিধা ফলাও করে বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের। গ্রামের মাঝখানে ছোট মতন একটা মুদি দোকান। এটা না ঘর না দোকান এমন দেখতে। যে বৃদ্ধ মানুষটা দোকান সামলাচ্ছিলেন তার পরিধানের ধুতিটায় রাজ্যের ময়লা, যেন চিমটি কাটলে নখের ডগায় উঠে আসবে! দোকানদারের অবস্থা খদ্দেরের ক্রয় ক্ষমতাকে নির্লজ্জ ভাবে জাহির করে দেয়। শিক্ষক সংশয়পূর্ণ চোখে দেখেন কাচের শিশিতে কম দাম। বিস্কুট, লাল-নীল লেবু-লজেন্স, তারই পাশে দাঁড়িতে ঝুলছে একছড়া কলা। দোকানটার বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে মোটা দানার নুন থেকে খেসারি ভাজা পর্যন্ত পাওয়া যায়। দোকানদারের সঙ্গে যেচে আলাপ করলেন শিক্ষক। দোকানদার শুকনো মুখে বলেন, হ বাবু, এ গাঁয়ে আর কুনো দুকান নাই। মোর দুকানে খাওয়ার সোডা, ভাস্কর নমক, হরিতকী-বহেরা-ত্রিফলা সব পাওয়া যায়। সাবু বার্লি সব রেখেছি, যার যখুন দরকার কিনে লিয়ে যায়।

—কোন হাসপাতাল নেই? শিক্ষকের কথা শুনে মুদি দোকানী হাসলেন, হাসপাতাল গুটে (একটা) আছে, সিটা ইখান থিকে চার ক্রোশ দূরে। রাত-বেরতে কার কিছু হলে লিয়ে যেতে যেতে দম এটুকে দিওবোঙার কাছে চলে যায়। কি করব বাবু, আমরা গরীব লোক, মোদের কথা শুনার কেউ নেই।

—ভোট হয় না?

—হয় বাবু। আগে তো পাঁচ সাল বাদ বাদ হোত, এখন পেরাই হয়। ভোট দিতে দিতে আমার বাবু হেঁপসে গেলাম! আর ভালো লাগেনি গো। ইবার ভোট হলে আমরা ছাপ্পা দিব নাই। ভোট দিয়ে কি হয়? হা দেখ, নদীটা বর্ষা কালে কেমন ফুঁসে! নদী পেরলে পাহাড়ের কোলে পরপর তিন তিনটে গাঁ। মানুষগুলো কাঁড়ার (মহিষ) মত সাঁতরে সাঁতরে এপাড়ে আসে। আমাদের ছুয়ামেনে (ছেলেরা) ইস্কুল ঘরে পড়তে যাই পারেনি। তারা এট্টু জোয়ান হলেই ভিন গাঁয়ে ভূতিয়া খাটতে চলে যায়। তার বাপ-মা'রা জন মজুর খাটে। গাঁয়ে কাজ নেই, সকাল হলেই টেউনে গিয়ে কাগের মতুন বস্যে থাকে। যেদিন কেউ ডেকে নিয়ে যায়, সেদিন তারা দুটো খেতে পায়।

কাজ না পেলে পেটে হাত বোলায়। এ তো রোজকার ঘটনা বাবু। বৃদ্ধ মুদি দোকানী শূন্য চোখে তাকালেন।

যেখানে বুড়ো খিরিশ গাছটা আছে সেই জায়গাটা গ্রামের নাভিস্থান। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, বেলে আর কাঁকুরে মাটির ভাগ বেশি থাকায় জল হলে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। ছেলে-মেয়েরা এমন একটা সুন্দর জায়গা দেখে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এদিকে সূর্য একেবারে মাথার উপর। শিক্ষক বলেন, এখন টিফিন আওয়ার্স। তোমরা এবার টিফিন খেতে পারো। সামনে একটা কুয়ো আছে, কিন্তু খবরদার কুয়োর জল তোমরা কেউ খাবে না। যারা ওয়াটার পটে জল এনেছো, সবাই মিলে ডিসট্রিবিউট করে খাও।

—স্যার, কুয়োর জল খাব না কেন?

—জলে পোকা আছে। তাছাড়া আনহাইজেনিক।

—এরা যে খায়! কই এদের তো কিছু হয় না?

—ওটা ওদের অভ্যেস।

খিরিশ গাছের ছায়ায় বসে টিফিনের বাক্স খুলেছে ওরা। কেউ এনেছে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের লুচি, আলু ভাজা আর কালাকান্দ; কেউ আবার সুজির হালুয়া, চমচম আর মিহিদানা। কারোর আবার পরোটা ভিজে গিয়েছে মাংসের কিমায়। টিফিনের ঢাকনা খোলার সাথে সাথেই মুখরোচক সুগন্ধের প্রতিযোগিতা জমে ওঠে বাতাসে। সেই গন্ধ পেয়ে কিংবা ঝলমলে পোশাকের ছেলে-মেয়েদের দেখার লোভে কাতারে কাতারে ছুটে আসে গ্রামের কাচ্চা-বাচ্চা, কিশোর-কিশোরীরা। তারা লোভী চোখে ভ্যাল ভ্যাল করে দেখে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউ পরোটা চিবায়, কেউ আবার মিষ্টি ভেঙে খায়, কেউ আবার ফ্ল্যাস্ক খুলে ঢক ঢক করে জল খায়।

বয়স্ক শিক্ষার আসর আর হয় না। গ্রামের দু'একজনকে ডাকতেই তারা ভয়ে দশ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ায়, কাছে আসে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শহুরে মানুষ গুলোর মজা দেখতে থাকে আর ভাবে, কি পাগল মানুষ এরা, নাহলে শহরের অত সুন্দর রাস্তাঘাট ছেড়ে কোন আহম্মক গ্রামে এসে কাদা ঘাটে। মশার কামড় খায় দিনের বেলায়!

গ্রামে একটা টালির চাল, মাটির দেওয়াল দেওয়া স্কুল। ইংরেজির স্যার খোঁজ নিয়ে জানলেন—এই স্কুলে তিনজন টিচার। তারা বেশিরভাগ দিন আসেন না, মাসের শেষে এসে একদিনেই অ্যাটেনডেন্সে সই করে চলে যান। যেমন রাখাল তেমন গরু, কেননা ছাত্র-ছাত্রীরাও গরজ করে নিয়ম মাফিক স্কুলে আসেনা। যেদিন বুলগার হুইটের খিচুড়ি দেওয়া হয় কিম্বা শহর থেকে মুড়ি বা পাউরুটি আসে কেবল সেদিনই তারা বইখাতা শ্লেট নিয়ে স্কুলে আসে।

এই চাষের সময় স্কুলের হেড মাস্টার মশাই সব চাইতে ব্যস্ত মানুষ। তার দশ বিঘা ধানজমি। তিনি এখন চাষ আবাদে মগ্ন। পোস্টাপিসে গত মাসের বেতনটা এসেছে কিনা শুধু এই খোঁজটা নিয়েই মাঠের দিকে চলে যান। যে আশা এবং কর্মসূচি নিয়ে ওরা এখানে এসেছিল তার ছিঁটে ফোঁটাও ফলপ্রসূ হয় না। ইংরেজির স্যার হতাশ গলায় বলেন, চল, এবার আমরা ফিরে যাই! যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তা মোটামুটি ফুল-ফিল হয়েছে। এদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবলেম, একদিনে সল্ভ করা যাবে না। মনে রেখ, সমুদ্র মন্থন কিন্তু একদিনে হয়নি। এর জন্য অধ্যাবসায় এবং সততার প্রয়োজন। তোমরা যদি ওদের ভালবাসতে শেখ তাহলে ওরাও তোমাদের ভালবাসবে। আচ্ছা, এবার তোমরা সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়াও আমি রোল কল করব।

রোল কল শেষ। এবার ফেরার পালা!

শিক্ষক বলেন, আচ্ছা সৌমিত্র তুমি বলো, কৃষক বলতে তুমি কি বুঝলে?

সৌমিত্র আমতা আমতা করে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে—স্যার কৃষক বলতে আমরা বুঝি, খালি পা খালি গা রোগা চেহারার কালো কালো মানুষ। ওরা মাঠে কাজ করে, ফসল ফলায়। সেই ফসল খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি। পুরো দেশের হৃৎপিণ্ড বলতে ওরাই।

—ভেরি গুড। শিক্ষকের ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ে তৃপ্তির হাসি। তিনি উৎসাহিত হয়ে বলেন, এই যে সায়নী, তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি—তুমি তো গ্রামটা ঘুরে ফিরে দেখলে, এবার তুমি এই গ্রামটির সম্বন্ধে আমাদের কিছু শোনাও।

সায়নী ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল। সে ঠোঁট কামড়ে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে, তারপর উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা দিয়ে শুরু করে—দ্য কক্ ইজ ক্রোয়িং,/দ্য স্ট্রীম ইজ ফ্লোয়িং,/···দ্য গ্রীন ফিল্ড শ্লিপস্ ইন দ্য সান্;···স্যার গ্রাম বলতে আমি বুঝি—পচা কাদা, হাতির মত মশা···আর আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে তার মত হাজার কয়েক মানুষ। এরা বড় গরিব। দু-বেলা পেট ভরে খেতে পায় না অথচ এরা খুব রাক্ষসের মত খেতে ভালবাসে।

—সাট আপ্। তুমি একটা ইডিয়েট। তোমার কোন হিউম্যানিটি নেই। প্রিন্সিপ্যালের সামনে তুমি এমন কথা বললে তোমাকে টি. সি দিয়ে দেবেন।

—আমি যা বলছি তা তো বাড়িয়ে বলিনি স্যার।

—সব সময় সত্যি কথা বলতে নেই, চলো।

—সায়নীর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, সে মুখ নিচু করে হাঁটে। অপমানে নীল হয়ে গেছে লাবণ্যময় মুখ, তার ঠোঁট কাঁপে। কিছুটা এসে ওরা আবার দাঁড়িয়ে পড়ে সেই বুড়ো খিরিশের তলায়, তখনও কাচ্চা-বাচ্চার ভিড়। তারা হুড়োহুড়ি করে কি যেন কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। যার গায়ে জোর বেশি

সে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে দুবলা পাতলা ছেলে-মেয়েদের। মুখ থুবড়ে পড়ে কেউ কাঁদছে, কেউ বা সরে দাঁড়িয়েছে ভয়ে।

শিক্ষক আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করেন, বলতো, ওরা কি খেলছে ?

সবাই চুপ। শুধু এগিয়ে আসে নয়না, স্যার, ওরা খেলছে না ; মারামারি, ঠেলাঠেলি করছে।

—কেন ?

নয়না থমথমে গলায় বলে, স্যার আমাদের ফেলে দেওয়া টিফিনগুলো ওরা কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে। আমি ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—এঁটো খাবার খাচ্ছো কেন ? প্রশ্ন শুনে সে ছলছলে চোখে তাকিয়ে বলল, তার খুব ঘন ঘন খিদে লাগে অথচ সারাদিন সে কিছু খায়নি। তার মা-বাবা খাটতে গেছে। ফিরে এলে উনুন জ্বলবে। বলুন স্যার, এবার অ্যানুয়াল পরীক্ষায় 'গ্রামদর্শন' যদি রচনা আসে তাহলে আমি কি এই কথাগুলো লিখব ?

শিক্ষক এতক্ষণ মুখ নিচু করে শুনছিলেন। সহসা তিনি মাথা উঁচু করে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ-লিখবে, একশ বার লিখবে। তোমরাই তো সারিয়ে তুলবে গ্রামের ক্ষত।

লাঠি

ট্রেন থেকে নামতেই চোখে আঁধার দেখে সামারুবুড়ো। পা চলে না, গোদা পা দুটো হাতির পায়ের চেয়েও ভার ঠেকে। আসার সময় মতিয়া বুড়ি বলেছিল, যেওনি গো, অমন গোদাপারা পা নিয়ে কেউ কি বেটির কাছে যায়? তুমার যেমন খেয়েদেয়ে কাজ নেই। দেখবা, বিটির আমার গোঁসা হবে। কথাটা কানে তোলেনি সামারুবুড়া। একমাত্র মেয়ে চোমানি এখন হাসপাতালের নার্স। ফর্সা, সাদা ধবধবে শাড়ি পরে সে যখন রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করে, তা দেখে গর্বে বুক ভরে যায় সামারুবুড়ার। গাঁয়ে ফিরে সবাইকে তা রঙ চড়িয়ে বলে। বলতে তার গর্ব হয়। অমন মেয়ে লাখে একটা। আশপাশের দশটা গাঁয়ে চোমানির জুড়ি মেলা ভার। সে হল এই পোড়ার সংসারে পূর্ণিমার চাঁদ।

তাই মতিয়াবুড়ির কথায় সামান্য অভিমান হয় বুড়ার। রাঙা চোখে বুড়িকে সে শাসন করতে পারে না। শুধু কথার পিঠে কথা দিয়ে বলে, বেটি আমার তেমন নয় গো, আমি গেলে সে বড় খুশি হয়।

স্টেশনের বাইরে আসতে দম বেরিয়ে যায় সামারুবুড়ার। স্টেশন চত্বরে কুলিগুলোর বড়ো খাঁই। দর দামে পরতা না হতেই বোঁচকা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে সে। নিজের জিনিস নিজে বইবে তাতে আবার লজ্জা কি।

রিক্সাওলাটাও মহা ধড়িবাজ। মুখে তার মিছরিদানা হাসি। খৈনি মুখে পুরে চিরিক জল কেটে বলে, যেতে হলে তিন টাকাই লাগবে। এর কমে হবেনি দাদু। পথ তো কম নয়, পাক্কা তিন মাইল।

ফাঁপড়ে পরে সামারুবুড়া। মেয়ের কাছে আসবে বলে উধার এনেছে বিশ টাকা। তার মধ্যে ট্রেনভাড়া দশ টাকা। এটা সেটা আরো আট টাকা কোথা দিয়ে যে বেরিয়ে গেল সেটাই এখন চিন্তার। কেনার মধ্যে জিলিপি কিনেছে দশটা। নাতনি আছে। খালি হাতে তো যাওয়া যায় না। সেবার খালি হাতে গিয়ে অনেক কথা শুনেছে। চোমানির কাজের মেয়েটা হাসতে হাসতে বলেছে, খালি হাতে কি আসতে হয় মেসো? নাতনির জন্য কিছু আনোনি? হা, দেখ দিকি বেচারি কেমন তুমার থলিটা পাগলের মতন খুঁজচে!

এক ধমক দিয়ে চোমানি তাকে থামিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু বুকের ঝড়টা থামেনি। গেল বছর খরায় ধান গেল। মহুয়া বেচার ক'টা টাকায় ট্রেন ভাড়াটা উঠেছে। অতটা পথ মুখ একেবারে শুকনো, এমন-কি জল কাটেনি দাঁতে।

ভুল মানুষ মাত্রই হয়, কিন্তু শুধরে নিতে কতক্ষণ। গতবারের

অবস্থা আর এবারের অবস্থায় আকাশ পাতাল ফারাক। এ বছর বর্ষা হয়েছে অঢেল। ধানের গোছ দেখে ভরে গিয়েছে মন। মেয়ের কাছে আসবে বলে ধান কুটে চাল করে দিয়েছে মতিয়াবুড়ি। তার বেতো গতর। তবু হাসিমুখে হাড়িয়া চালের ভুজা ভেজেছে চুলার ধারে বসে। চোমানি আখ চিবুতে ভালবাসে বলে চার টুকরো আখও বেঁধে দিয়েছে পোঁটলায়। চাল, মুড়ি আর আখ ছাড়াও এক থলিয়া টোপা কুল। আইবুড়ো অবস্থায় নুন চাখা দিয়ে কুল খেতে বড় ভালোবাসত। সবকিছুই মনে রেখেছে মতিয়াবুড়ি। বুড়ো সব অবাক হয়ে দেখেছে। ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং নাড়িয়ে মুখে বিড়ি টেনেছে দমসে। এখন সে সব জিনিস নিয়ে হ্যাপা হয়েছে সামারুবুড়ার। রেল ইস্টিশান থেকে চোমানির বাসাবাড়ি তিন মাইলের কম হবে না। এতটা পথ এই তীব্র শীতের সাঁঝে হেঁটে যাওয়াই দুষ্কর। বাগ বুঝে রিক্সাঅলা বলে, তিন টাকার কমে হবেনি। সামনে হাওয়া। রিক্সা ঠেলতে আমার ঘাম বেরিয়ে যাবে।

মাত্র দুটো টাকা সামারু বুড়ার ঝুলিমনিতে ঠনঠনায়। তবু, সামারু বুড়ার রিক্সায় চাপার প্রবল শখ। সেবার পায়ে হেঁটে গিয়েছিল বলে চোমানি তাকে কত কথাই না শোনাল। সে সব কথা এখনও ভোলেনি। বরং মনে পড়লে কেমন ঝিমিয়ে যায়। মেয়ের মুখটা ধোঁয়াশা দেখে চোখে। চিনতে পারে না, এ চোমানি তাদের ঘরের না অন্য কারোর!

গদাধর চোমানির সঙ্গে এক হাসপাতালে কাজ করে। সে ক্লাস ফোর স্টাফ। মাঝে মধ্যে চোমানির সংবাদ গদাধরই বয়ে আনে। গেল হপ্তায় সে এসে বলে গেল, খুড়া গো, বেটি তুমার সুখেই আচে। এ মাসে এট্টা ফিরিজ কিনেচে। কথাটা বলেই গদাধর হেসে উঠেছিল তীব্র। তার দু আঙুলের ফাঁকে শহরের সিগরেট।

কথাটা বুঝতে না পেরে অবাক গলায় সামারু বুড়া শুধিয়েছিল, তা বাপ, ফিরিজ—সেটা আবার কী?

—ফিরিজ বোঝ না? ঠাণ্ডা মেশিন। জল রাখলে বরফ হয়ে জমে যায়। ঠিক বরফ নয়, পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল সামারুবুড়ার চোখ-মুখ। মতিয়াবুড়ি পাশে সরে এসে ঠেলা মেরে বলেছিল, বেটির আমার বহুৎ উন্নতি হয়েচে। তা হোক। শুধু দুঃখ এট্টা। সে আমাদের ভুলে গেল গো! ন'মাসে ছ'মাসে এট্টা চিঠি দিয়েও খোঁজ নেয় না, আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি।

মতিয়াবুড়ির আফসোস সেদিন ফাঁকা বাতাসে হারিয়ে গিয়েছিল। সামারুবুড়ো হাসতে হাসতে দুঃখ চেপে বলেছিল, যেমন দেশ, তেমন বেশ।

বেটির কুনো কুসুর নেই গো। ও-কি এখন আমাদের মতন অশিক্ষিত আচে ?

মাত্র এক টাকার অভাবে কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে সামারু বুড়া। স্টেশন চত্বরে পটপটিয়ে জ্বলে উঠেছে বাতি। সেই আলোর নিচে কত মানুষের যাতায়াত। সন্ধে লাগার মুখে রেল শহরের রূপের বাহার চোখে দেখার মতো। সামারুবুড়ার শীত লাগতেই সে গায়ের ময়লা চাদরটা জড়িয়ে নেয় ভালো ভাবে। তবু শীতের প্রকোপ কমে না। পাহাড় দেশের শীত যেন ময়াল সাপের গা, শুধু ছোঁয়াতেই শিউরে ওঠে সর্বাঙ্গ। সামারুবুড়ার পায়ের চেটো থেকে হিম ঢেউটা একেবারে চুলের গোড়া পর্যন্ত পেঁছে যায়। কেমন জড়সড় হয়ে সে তাকিয়ে থাকে ঝলমলে শহরটার দিকে। যত দেখে, তত যেন নেশা ধরে চোখে। বিস্ময়ে নেচে ওঠে চোখের তারা। গাঁয়ে থাকলে এসব আলো ঝলমলে বাহার শুধু স্বপ্ন দেখার মত মনে হয়। অভাব অনটন দরিদ্রতা যেন গাঁয়ের চাম এঁটুলি। মানুষগুলো দুটো ভাতের জন্য জান কবুল করে লড়ছে। সে দলে সামারুবুড়াও আছে। চোমানি সরকারি কাজে ঢোকার পরে লোক ভেবেছিল, যাক, এবার বুড়োর দুঃখ-কষ্ট কিছুটা ঘুচবে। মেয়ে যখন হাসপাতালের নার্স, তখন নিশ্চয়ই বুড়ো বাপটারে নিজের কাছে নিয়ে রাখবে।

এই সুপ্ত আশা সামারুবুড়ার দীর্ঘদিনের। তবে সে কোনোদিন মেয়ের কাছে মুখ ফুটিয়ে তা ব্যক্ত করেনি। সে তার নিজের কর্তব্য করেছে, প্রতিদানে যদি কিছু নাও পায়, তাতে তার কোনো দুঃখ নেই। পেট দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। সামারুবুড়া এই কথাটাকে লাখ কথার এক কথা বলে মানে। তাই, মেয়ের কামাইয়ের ওপর তার কোনো লোভ নেই। আজ ছ'মাস থেকে মেয়ের কোনো চিঠিপত্তর নেই। ভালমন্দ খবর না পেলে এই বুড়ো বয়সে মনটা বেজায় টাটায়। সর্বক্ষণ কু' গায় মন। বুড়িটা শালগুঁড়িতে ঘাষি দিতে গিয়ে আপনমনে কাঁদে। সে বড় চাপা স্বভাবের। তার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। এসব কিছুই নিজের চোখে দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করেছে সামারুবুড়া। তখন মেয়ের ওপর তার রাগ-অভিমান জন্মেছে। মেয়েটা এত তাড়াতাড়ি বদলে যাবে, এমনটা তার ধারণার বাইরে ছিল। এই শহর কি তাহলে মানুষকে গিরগিটির মতো বদলে দেয় ? আলোর মাঝে দাঁড়িয়ে আঁধারে ভরে যায় সামারুবুড়ার দু'চোখ। বুঝতে পারে, কলজে লাফাচ্ছে। শ্বাস নিতেও কেমন কষ্ট। মানুষের হৈ-হট্টগোল তাকে যেন আরো অস্থির করে দেয়। রিকশাঅলা ঠায় সামারুবুড়ার মুখের দিকে

তাকিয়ে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বলে, তা দাদু, যেতে হলে চল। না-হলে আমাকে ছেড়ে দাও, অন্য খদ্দের দেখি।

সামারুবুড়ার ফাঁপরে-পড়া মুখ। অনেক ভেবে বলে, ঠিক আছে, চলো। বিটি আমার বড় হাসপাতালের নার্স। তার কাচ থেকে টাকা চেয়ে তুমার রিকশো-ভাড়া আমি মিটিয়ে দেব।

কথাটা মনে ধরে রিকশাঅলার। চালের বস্তাটা টেনে তুলে সে রিকশা ছোটায় কলোনির দিকে। সামারুবুড়া একটা বিড়ি ধরিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দেয়। তিন মাইল পথ একটা বিড়ির পথ নয়, তবু যেন দ্রুত পেঁাছে যায় ওরা। রিকশা থেকে নেমে এসে বুড়ো দেখে, তালা ঝুলছে চোমানির ঘরে। রিকশাঅলা গায়ের ঘাম মুছে বলে, কই গো, এবার আমার ভাড়াটা মিটিয়ে দাও। বম্বে মেল আসার সময় হল, চটজলদি স্টেশনে ফিরে যাই।

দুটো টাকা খাকি প্যান্টের পকেট থেকে বের করে দেয় সামারুবুড়া, তাতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে রিকশাঅলা। জ্ঞানহীন মানুষের গলায় বলে, দু'টাকায় হবেনি, পুরা তিন টাকাই লাগবে। আমার ঘাম অত মাগনা নয়, দাও টাকা দাও—। বলেই হাত বাড়িয়ে দেয় রিকশাঅলা।

কুণ্ঠাজড়ান চোখে সেই বেঢপ তালাটার দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক। এই সাঁঝের বেলায় কোথায় গেল ওরা? বাতি সব নেভান। বারান্দার কাপড় শুকানোর তারটাও ফাঁকা। এ অবস্থায় সামারুবুড়া যে কী করবে কিছু ভাবতে পারে না। একখণ্ড আখ ধরিয়ে দেয় রিকশাঅলার হাতে। কাতর গলায় বলে, তুমি আমার বেটার মতন, দুটো টাকা আর এই আখটা নিয়ে তুমি আমায় রেহাই দাও। এই নাক-কান মুলচি, এমন বেআক্কেলিপনা কুনো দিন আর হবে না।

—তাই বললে হয়? এটা কি এক টাকার আখ! পয়সা নেই তো চাল দাও। যত সব ধান্দাবাজ, ঠগ মাস্টার।

কথাটা সুঁচ ফুঁড়িয়ে দেয় বুকে। কেমন মিনমিনে গলায় সামারুবুড়া বলে, ভোজনাধানের চাল বিটির জন্যি এনেচিলাম। সে খুব ভালবাসে!

বস্তা খুলে প্রায় সের দুয়েক চাল গামছায় বেঁধে রিকশাঅলা চলে যায়। তারপর থেকে বেজার মুখে সামারুবুড়া বারান্দার এক কোণে জবুথবু হয়ে বসে থাকে। শীত হাওয়া সেখানেও আছড়ে পড়ে সমানে। কলোনির কুকুরগুলো ডাকতে-ডাকতে চলে যায়। আঁধারে ঘাপটি মেরে বসে থাকে বুড়ো। একটা বিড়ি ধরাবে, তেমন সাহসও হয় না। পাশের ঘরগুলোয় হাসি, হৈ-হুল্লোড়ের ধুম। চালের বস্তাটাকে বুকের কাছে এনে শীত তাড়ায় সামারুবুড়া।

রিকশাঅলা চলে যাওয়ার পর বাসাবাড়ির সামনের মোরাম-ফেলা পথটা বড়ো শুনশান। শীতকাল বলেই প্রায় সবারই দরজা-জানলা আঁটা। কলোনিতে আলো ছিল না, রাস্তার বাতিগুলো কুয়াশায় ঠাণ্ডা। একভাবে বসে থেকে ঝিমুনি আসে সামারুবুড়ার। ঘরের কথা ভাবে, মতিয়াবুড়ির কথা ভাবে। বিড়ি ধরিয়ে মুঠো-করা হাতটা মুখের কাছে এনে হু হু করে কাঁপতে থাকে সে। কখনও খকখক করে কাশে। শ্লেষ্মা ছুঁড়ে দেয় বারান্দার নিচের জমিটায়। আবার জড়সড় হয়ে বসে চালের বস্তাটা টেনে নেয় নিজের কাছে। বস্তার আড়ালে শীত হাওয়াটা সামান্য কম লাগে। চালের বস্তাটা চাদরের মতো কাজ করে।

রাত বাড়ে তবু চোমানি আসে না। খিদেয় গা চটকায় সামারুবুড়ার। সেই কখন খেয়েছিল দুটো জলঢালা ভাত। সঙ্গে মুংগা শাকের ভাজি। হারা-মরিচ আর লবণ চাখা। তারপর, পুরো ট্রেনটায় দাঁতে জল কাটেনি। খাবে যে তেমন ট্যাকের জোর কোথায়? সামান্য নড়াচড়ায় শালপাতায় মোড়া জিলিপিগুলো নজরে পড়ে তার। খসর-খসর শব্দ হয়, লোভ জাগে মনে। দশটা জিলিপির দুটো খেয়ে নিলে এমন কিছু এসে যায় না। এই ভেবে হাতটা ঠেকিয়ে দেয় ঠোঙায়, কিন্তু পরক্ষণেই ঘুরিয়ে আনে। লোভ সংবরণ করে নিজেকে ধমকায়। বলে, লুভা, লুভা কোথাকার! বুড়া বয়সে তুর এত নুলা। ছ্যা-ছ্যা—

তখনই তারা-ফোটা আকাশে নেমে আসে কালো মেঘের দল। বাতাস থেমে গিয়ে স্থির হয়ে ঝুলে থাকে শীতের রাতে চরতে-আসা গাভিন মেঘগুলো। তাদের এত গোমড়া মুখ দেখলেই ধড়াক করে ওঠে জান। আর বসে থাকতে পারে না সামারুবুড়া। মাজার হাড় ফুটিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে নেমে আসে নিচে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় আকাশের দিকে তাকায়। উজ্জ্বল তারাগুলোকে সে আর দেখতে পায় না। ঝিঁঝি ডাকে। ঢোলকলমীর ঝোপ থেকে উঠে আসে বিচিত্র পোকামাকড়ের ধ্বনি। মুহূর্তে বদলে যায় চেনা পৃথিবীর রূপ। খিদেটাকে সামারুবুড়া আর সহ্য করতে পারে না। রাস্তার ধারের চাপা কলটায় ঘটাং ঘটাং শব্দ হয়। সামারুবুড়া ভরপেট জল খাওয়ার লোভে দ্বিধাভরা মনে এগিয়ে যায় চাপা কলটার দিকে। কিন্তু বেশি দূর সে যেতে পারে না। হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামে। পাড়ার কুকুরটা তার অগোছাল কিম্ভূতমার্কা চেহারা দেখে বেরিয়ে আসে বাগান থেকে। বৃষ্টি মাথায় ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায়। সামারুবুড়ার জল খাওয়া হয় না, পড়িমরি করে ছোটে। কোনোমতে হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে আসে বারান্দায়। বেয়াড়া কুকুরটা তবু তার পিছু ছাড়ে না। নখের আঁচড়ে ঘাস ছিঁড়ে সে তারস্বরে

ডাকতে থাকে। বারান্দায় কাপড় তুলতে এসে এমন দৃশ্য দেখে বেদম ভয় পেয়ে যায় পাশের ফ্ল্যাটের ফর্সা বউটা। বিদ্যুতের আলোয় সে দেখে লাঠি হাতে মারমুখী এক চাষাড়ে বুড়ো। কুকুরটা বৃষ্টি মাথায় তোয়াক্কাহীন ডাকছে।

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত, রীতিমতো সন্দেহজনক। শুকনো কাপড়গুলো বুকে চেপে এক লাফে বারান্দায় উঠে আসে ফর্সা বউটা। তারপর জাফরিটার হুড়কো তুলে চেঁচিয়ে ওঠে—চোর, চোর···

বৃষ্টি মাথায় সামারুবুড়াকে চোখের পলকে ঘিরে ধরে জনা দশ-বারো মানুষ। তাদের হাতে লাঠি, টর্চ আর ধারালো অস্ত্র।

কম্পমান সামারুবুড়া হাতজোড় করে বলে, বাবু, আমি চোর নই গো, বেটির কাচে এয়েচি।

—বেটি? কে তুমার বেটি? এ-কথায় মানুষগুলো হা-হা করে হাসে।

মাথায় হাত দিয়ে, লাঠিটা শানের ওপরে নামিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে সামারুবুড়া। বেশ কয়েকটা টর্চের আলো সরাসরি তার মুখের ওপর পড়েছে। সেই সময় তীব্র হেডলাইটের আলো ফেলে ব্রেক করে দাঁড়ায় একটা মোটর সাইকেল। চোমানি সিস্টার নেমে আসে তার বাচ্চা মেয়েটার হাত ধরে। তার স্বামী মোটরসাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে বারান্দা অব্দি।

তখনো ঝড় থামেনি, বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপিয়ে। অশথ গাছের পাতায় হাওয়া লেগে ভৌতিক একটা শব্দ ওঠে চরাচরে। অনেকক্ষণ পরে চোমানি শুধায়, কি হয়েছে?

আবার একসঙ্গে অনেকগুলো টর্চের আলো আছড়ে পড়ে সামারুবুড়ার মুখের ওপর।

চোখে হাত ঢেকে সামারুবুড়া আবার উঠে দাঁড়ায়।

লোকগুলো বলে, দেখুন তো সিস্টার, এই লোকটিকে চিনতে পারেন কিনা। সেই সন্ধে থেকে আপনার বারান্দায় বসে আছে।

চোমানি কোনো উত্তর দেয় না। অপমানে লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ। নিঃশব্দে বারান্দায় উঠে এসে সে তালা খোলে। বিরক্তিতে মুখ বেঁকিয়ে বলে, আসবে যখন চিঠি দিয়ে ত আসতে পার! এভাবে আমার মুখটা না পোড়ালেই পারতে!

—এ কী বলছিস বেটি? জড়তা কাটিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সামারুবুড়া, বাপ হয়ে বেটির মুখ কি পোড়ানো যায়? অনেকদিন হল তার কুনো চিঠি পাইনি। তোর মা দিনরাত কাঁদে। তাই সেই থেকে ঠায় বসে আচি—

—ভালো করেছ, এবার ঘরে এসে আমায় উদ্ধার কর। কথাগুলো বলে দুপদাপ পায়ে ঘরে ঢুকে যায় চোমানি। তার হাঁটার ভঙ্গিটা এতই দৃষ্টিকটু

যে, সামারুবুড়ো হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অপমানে জেগে ওঠে মুখমণ্ডলের নীল শিরা-উপশিরা। হেঁট মাথায় চালের বস্তাটা টানতে-টানতে ঘরে ঢোকে সামারুবুড়ো।

চোমানি রান্নাঘর থেকে দেখতে পেয়ে শুধায়, বস্তায় কী আছে ?

—ভোজনাধানের চাল, তোর মা পাঠিয়ে দিয়েচে।

—এখানে কি চাল পাওয়া যায় না, অতদূর থেকে আনার কী দরকার ছিল ? তোমাদের যত বাড়াবাড়ি। লোক দেখলে কী বলে বলো তো ? তাছাড়া, তোমার জামাই এ-সব পছন্দ করে না। চোমানির কথাগুলোয় বিষের জ্বালা, তাতে আরো নীলচে হয়ে যায় সামারুবুড়োর মুখ। চোমানি বলে, এই পোশাকে কেউ কি শহরে আসে ? আসার যদি অত শখ তাহলে আমাকে চিঠি লিখলে পারতে। আমি জামাকাপড় সব খরিদ করে পাঠিয়ে দিতাম। ছিঃ ছিঃ, লজ্জায় আমার মুখ দেখানো দায়—

সামারুবুড়ো চুপ করে থাকে। মানুষের কথায় যে এত বিষ থাকে সে আগে জানত না। মাথার চুল চেপে ধরে বলে, তুই চুপ কর বেটি। মাথাটা আমার বড্ড ধরেচে।

—চা করে দেব ?

—না, থাক। তোর কষ্ট হবে। আর্দ্র অভিমানে ছলছল করে সামারু-বুড়োর চোখ। চোমানি কিছু না বলে রান্নাঘরে চলে যায়। অনেকক্ষণ পরে এককাপ চা ঠকাস করে নামিয়ে রাখে সামারুবুড়োর সামনে। দায়সারা গোছের মন নিয়ে বলে, খেয়ে নাও। মেয়েটা খুব কাঁদছে, ওকে একটু ঠাণ্ডা করে আসি।

চোমানির মেয়েটার গায়ের রঙ অনেকটা মহুয়া ফুলের মতো, পাঁচ বছরের মেয়েটা যেন কথার জাহাজ। সে এসে খেলছে সামারুবুড়োর সাথে। অল্প সময়ের ব্যবধানে মেয়েটি আপন হয়ে উঠেছে তার কাছে। জড়তাহীন মেলামেশায় স্বাচ্ছন্দ ফিরে পায় সে। চোমানিও আগের তুলনায় অনেক বেশি সপ্রতিভ, কাজের ফাঁকে মুড়ি মেখে দিয়ে গেছে এক বাটি। মেয়েটা বড়ো দুরন্ত। হেসে গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার ঝোলাতে কী আছে গো ? দাদু ?

তখনই মনে পড়ে যায় জিলিপির কথা। শালপাতার ঠোঙায় মোড়া জিলিপিগুলো সঙ্গে সঙ্গে বার করে আনে সামারুবুড়ো। তারই দুটো ধরিয়ে দেয় নাতনির হাতে। মেয়েটা খুশিতে কামড় মেরেছে জিলিপিতে—ঠিক তখনই সবেগ ক্ষিপ্রতায় নিষ্ঠুর হাত দিয়ে জিলিপি দুটো কেড়ে নেয় চোমানি! মেয়েটার নরম গালে জিলিপির চ্যাটচেটে রস। ভ্যাবাচেকা খেয়ে হাঁ করে সে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে।

চোমানি জিলিপিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় জানলার ও-পিঠে। বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দেয়, ছোটদের বাইরের জিনিস খাওয়ালে ওদের পেট খারাপ হয়। ওগুলো তুমি আর কাউকে দিও না। তোমার জিনিস তুমি খেয়ে নাও। একজন নার্স হয়ে মেয়েকে তো আমি বিষ তুলে দিতে পারি না।

—ছেলেবেলায় তুইও তো বড় জিলিপি খেতে ভালবাসতিস।

—সে-সব দিনের কথা ভুলে যাও।

সামারুবুড়ার চুপসানো মুখে কালির আঁচড়। জিলিপির ঠোঙাটা দু হাতে ধরে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে। এতক্ষণের অর্জিত ঝরঝরে পরিবেশটা মুহূর্তে মৃৎপাত্রের মত ভেঙে যায়। যে আশার সৌধ তার মনে গড়ে উঠেছিল তা যেন এক মুহূর্তের অবহেলায় ধুলোর চেয়ে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তবু জিলিপির ঠোঙাটা সে ফেলে দিতে পারে না, যেমন এনেছিল তেমনি ঢুকিয়ে রাখে পোঁটলায়। নির্বোধ মেয়েটি জিলিপি না পাওয়ার দরুন পা ছড়িয়ে কাঁদছে. তার চোখের উষ্ণ জলটুকুও মুছিয়ে দিতে পারে না সামারুবুড়া। ক্ষমতাহীন মানুষের পরাজিত দৃষ্টি যে কত মর্মভেদী হয়, তার জ্বলন্ত উদাহরণ সামারুবুড়া। পোকায় কাটা গাছের পাতারাও যেমন গাছকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, তেমন এক অদৃশ্য মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ সামারুবুড়ার বক্ষঃস্থল।

জামাইটা তার অন্য ধাঁচের মানুষ। সংসারে থেকেও যেন সে নেই। বড় শান্ত-শিষ্ট তার স্বভাব। শ্বশুর শীতে কষ্ট পাচ্ছে দেখে সে তার গায়ের শালটা জোর করে চাপিয়ে দিল সামারুবুড়ার গায়ে। হাসতে হাসতে বলে, পাহাড় দেশে শীতটা বড় জব্বর। যাওয়ার সময় ভালো দেখে একটা কম্বল কিনে দেব, নিয়ে যাবেন।

—তার আর দরকার কী বাবা? আমার তো চাদর আচে।

—তাই বললে কি হয়? আপনি বুড়োমানুষ, ঠাণ্ডা লাগলে কষ্ট হবে।

জামাই চলে যায় হাসতে হাসতে বড় ঘরে। চোখের জল আর আটকাতে পারে না সামারুবুড়া। ছোট মেয়েটার তা নজর এড়ায় না। সে চিৎকার করে বলে, ও মা, দেখে যাও, দাদু না কাঁদছে!

মা আসে না, আসে তার বাবা। চোমানির মেয়েটা বলে, এই দ্যাখো বাবা, দাদু কাঁদছে। মা না দাদুকে খুব বকেছে। আর জিলিপিগুলো ফেলে দিয়েছে জানালার ও-পিঠে। সেই থেকে দাদুর না খুব মন খারাপ।

জামাই ঘটনার গুরুত্বটা বুঝতে পেরে পাশে এসে বসে সামারুবুড়ার। তারপর পোঁটলা হাতড়িয়ে বের করে আনে জিলিপির ঠোঙা। একটা বের করে নিয়ে খেতে-খেতে বলে, বাঃ, ফাইন তো! তা কোথা থেকে এনেছেন?

অপমানিত চোমানি ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়, তোমার কি মাথা খারাপ

হল ? ছিঃ, ছিঃ ! ওগুলো রেখে দাও, কবেকার বাসি জিনিস। ওগুলো খেলে তোমার অ্যাসিড হবে।

জামাই হা-হা করে হাসে, যার লোহা খেলে হজম হয়ে যায়, তার জিলিপি খেয়ে অ্যাসিড হবে ? দারুণ কথা বললে তো তুমি !

চোমানি নিঃশব্দে রান্নাঘরে চলে যায়। অপমানটা তার শরীরে ফোসকা গেলে যাওয়ার মতো জ্বলছে, ফলে সব কাজে তার ভুল হয়ে যায়। বাবাকে সে আর সহ্য করতে পারে না। খাওয়ার সময় সামারুবুড়া আবার অস্বস্তিতে পড়ে। তার টেবিল-চেয়ারে খাওয়ার অভ্যাস নেই। রাগে গজগজিয়ে চোমানি বলে, দেখে খাও। সব ভাত যে মুখ থেকে ছিটকে পড়ছে। ঘরে ঝি নেই, আমাকেই সব একহাতে করতে হয়।

জামাই বলে, অভ্যাস না-থাকলে যা হয় ! উনি বরং নিচে বসে খান।

এবার যেন কিছুটা স্বস্তিবোধ করে সামারুবুড়া। থালাটা নিচে নামিয়ে পাত পেড়ে বসে। জামাইকে শুনিয়ে বলে, কুনোকালে যা হয়নি তা এই বুড়া বয়সে হয় কী করে ? অমনধারা ঘাড় সিধা করে খেতে গেলে গলায় আমার ভাত এটকে যাবে। আরামের ভাত আমার এই বুড়া পেটে সহ্য হবেনি বাপ।

সামারুবুড়া যখন খুব মনযোগ দিয়ে খাচ্ছিল তখন ডোর-বেলটা বেজে উঠল ঢং-ঢং। চোমানি গিয়ে এঁটো হাতে দরজা খুলেই অবাক। উচ্চহাস্যে বলে, উরেস্বাস, আমাদের কথা কি এতদিনে মনে পড়ল ? ইস, কী ভাগ্য আমাদের ! তোমাদের দেখা পাওয়া মানে যিশুর দেখা পাওয়া।

গাড়ি ফেল করে চোমানির ননদ-ননদাই এসেছে রাত কাটাতে। সঙ্গে তাদের আদরের সাদা বিলিতি কুকুরটা। সমস্ত আভিজাত্য তাদের কুকুরের গায়েও পরিস্ফুট। চোমানি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে, ননদের হাত ধরে উষ্ণ আতিথেয়তায় টেনে আনে ঘরের ভেতর। সামারুবুড়া খাওয়া ভুলে অবাক চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। রান্নাঘরে যাওয়ার সময় চোমানি বলে, তুমি একটু সরে ব'সো বাবা। দেখছ না কুকুরটা কী দুরন্ত ! এক্ষুনি পাতের ওপর হুমড়ে পড়বে।

চোমানির ননদ হেসে বলে, ভয় নেই। ডিম্পি ভাত খায় না। ভাত খেলেই বাত হবে। আর বাত হলেই বেশিদিন বাঁচবে না।

নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না সামারুবুড়া। তাদের গাঁয়ের কুকুরগুলো ফেনই পায় না, ভাত তো দূরের কথা। বুড়িটাকে যদি এমন আশ্চর্য জিনিস দেখাতে পারত।

পেট ফোলা স্যুটকেশটা বড় ঘরের খাটের তলায় রেখে এল চোমানি। এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, বলো কী খাবে—মাছ না মাংস ? জানো তো, গত

মাসে আমরা একটা স্কাই-কালার ফ্রিজ কিনেছি। দারুণ সস্তায় পেলাম, পাঁচশ টাকা অফ সিজিন ডিস্কাউণ্ট। বলেই হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ননদকে।

বিলিতি কুকুরের ডাক খেকী কুকুরের মতো নয়। কুকুরটা বার দুই বিকৃত স্বরে ডেকে উঠতেই চোমানি চলে যায় কুকুরের জন্য দুধ করতে। মেয়ের দুধের কৌটর সিল ভেঙে তৈরি হয় গাঢ় বট-আঠার মতো দুধ। স্টিলের পাত্রে নরম লাল জিভ ছুঁইয়ে বিলিতি কুকুরটা চুকচুক করে দুধ খায়। মেঝেতে বসে হাঁ করে দেখে সামারুবুড়া। ননদ-ননদাই আর তাদের সেই সাদা লোমের কুকুরটার খাতির যত্নে চোমানির ছোট্ট সংসার এখন উত্তাল। গ্যাস ধরিয়ে প্রেসার কুকারে ভাত বসায় চোমানি। ফ্রিজ থেকে বের করে আনে সকালের কেনা মাংস। ননদ-ননদাই বলে কথা! তাদের তো নিরামিষ ভাত দেওয়া চলে না। চোমানির ননদাই স্টিল প্ল্যাণ্টের ইঞ্জিনিয়ার। সজ্জন মানুষটি আপ্যায়নের আতিশয্যে কিছুটা বিব্রত।

খাওয়ার পরে শোওয়া নিয়ে গভীর সমস্যায় পড়ে চোমানি। দুটো মাত্র ঘর। একটা ঘরে ডবল বেডের খাট পাতা। ছোট ঘরটায় যে মেরুন রঙের সোফা-কাম-বেড আছে, তাতে একজনই কেবল শুতে পারে। এতগুলো মানুষ এই শীতের রাতে তাহলে শোবে কোথায়?

অনেক ভেবে চোমানি একটা সিদ্ধান্তে আসে। নিচু স্বরে সামারুবুড়াকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, আজকের রাতটা তুমি রান্নাঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকো বাবা। ঘরে লোক এসেছে—তাদের তো মেঝেতে শুতে দিতে পারি না। কথাগুলো বলেই সে অপ্রতিভ চোখে সম্মতির জন্য তাকায়!

সামারুবুড়া ঘাড় নাড়ে, আমার জন্যি ভাবিস নে। এট্টা তালাই আর চাদর হলে রাতটা আমি পার করে দেব।

আশ্বস্ত হয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে ফিরে আসে চোমানি। রান্নাঘরের ঠাণ্ডা মেঝে থেকে হিম উঠে আসে ভুরভুরিয়ে। মাদুর ভেদ করে শিরদাঁড়ায় খোঁচা মারে শীত। গায়ের পাতলা চাদরটাও অক্ষম শীতের সঙ্গে লড়তে থাকে। মশারাও ছেঁকে ধরেছে তাকে। ভোজবাড়ির উল্লাস তাদের ডানার কাঁপুনিতে। শীতে জড়সড় হয়ে বসে থাকে সামারুবুড়া। মেয়ের কথা ভাবে। কষ্ট পায়। খসে পড়া পুরনো ছালের মত চোমানি তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। চোমানি এমন এক উচ্চতায় পেঁৗছে গেছে, যেখানে সামারুবুড়া কোনদিন পেঁৗছতে পারবে না।

ঠায় বসে থাকলে কনকন করে শিরদাঁড়া। শরীরটা রাত উজগরাতে দুর্বল হয়ে পড়ে ক্রমশ। আলসেমিতে ভরে ওঠে চোখ। শিশির পড়ার শব্দে ঘুম

পায় সামারু বুড়ার। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে সে। ভাঁজ করা হাঁটু দুটো টেনে আনে বুকের কাছে।

ভোরের দিকে নিশ্চুপ পায়ে রান্নাঘরে ঢুকে আসে চোমানি। আলোটা জেবলে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবে। হয়ত নিজের বিরুদ্ধে তার এই নীরব যুদ্ধ। একসময় জিতে গিয়ে কঠিন হয়ে ওঠে চোখমুখ। হাঁটু মুড়ে সে বসে পড়ে সামারু বুড়ার বিছানার একপাশে। ঠেলা মেরে জাগিয়ে দেখে ঘুমন্ত শরীর। ফিস-ফিসিয়ে বলে, এতটুকুন ছোটো ঘর। জামাইয়ের বোন-ভগ্নীপতি এসেছে। এই অব্দি বলেই থামে চোমানি। প্রস্তাবটা দেওয়া সমীচীন হবে কিনা আর একবার ভেবে দেখে।

অভিজ্ঞ সামারু বুড়ার চুল-দাড়ি বাতাসে পাকেনি। আভাসটা স্পষ্ট বুঝতে পারে সে। মেয়ের পক্ষ নিয়ে বলে, ঠিকই তো। তোর খুব অসুবিধে—

—বোঝই তো সব। চোমানি দুটো দশ টাকার নোট ভাঁজ করে ধরিয়ে দেয় তার বাবার হাতে, ভোরে একটা ট্রেন আছে। বল ত তোমার জামাই মোটর-সাইকেল করে পেঁছে দেবে। আমি চা করে দিচ্ছি, তুমি চা খেয়ে তৈরি হয়ে নাও।

—তোদের আর কষ্ট করার দরকার নেই, আমি ইস্টিশানেই চা খেয়ে নিব।

সামারুবুড়াকে টাকাটা নিতেই হয়, না নিলে অতদুর সে যাবে কী করে ?

শীতের ভোরে বৃদ্ধ সামারুবুড়া হেঁটমুণ্ডে নেমে আসে রাস্তায়। কারোর ওপর তার কোনো রাগ-অভিমান নেই। এই ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্য সে তার নিজের ভাগ্যকেই দায়ী করে। একমাত্র মেয়েকে খেয়ে-না-খেয়ে শিক্ষিত করার জবালায় এই প্রথম সে কাতরে ওঠে আলো-ফোটা ভোরে। পথের বাঁক পেরোতেই তার খেয়াল হয়—সে একলা। বরাবরের একলা। চোমানি নেই, জগৎ সংসারে কেউ নেই তার সঙ্গে। এতবড় দুনিয়ায় সে একা হাঁটবে কী করে ? তখন চোমানির জন্য নয়—সে তার এতদিনের সঙ্গী লাঠিটা চোমানির ঘরে ভুল করে ফেলে আসার জন্য নিদারুণ কষ্ট পায়। মোচড় দিয়ে ওঠে বুকটা। ওদের সুখের সংসারে এমন একটা লাঠি বিসদৃশ। অথচ ঐ লাঠিটাই তার একমাত্র ভরসা। কিসের জোরে লাঠিছাড়া সে হেঁটে এল এতদূর—বিস্মিত না-হয়ে পারে না। যে মানুষটা লাঠি ছাড়া এক কদম হাঁটতে পারে না, লাঠি ভিন্ন যার চলেই না, সেই মানুষটাই লাঠিছাড়া কী করে এল এতদূরে ! আবার চোমানির বাসায় ফিরে যায় সামারুবুড়া। শীতে জবুথবু গতর। শিশিরে গোড়ালি ভেজা পা। ধুলোবালির দাগ। গাছের ভেজা পাতার দিকে তাকিয়ে তার চোখের পাতা ভিজে যায়।

বিতাড়িত বৃদ্ধ কাকের মত নয়, আত্মমর্যাদায় ভরপুর কোনো যুবকের মত সে চোমানিদের সামনের মাঠে দাঁড়ায়। কচি ঘাসের উদ্‌গ্রীব মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ভোরের নিস্তেজ আলোয় বুকভরে শ্বাস নেয়। রাতভোর মশার কামড়ে চাকড়া-চাকড়া হয়ে ফুলে গিয়েছে গা-হাত-পায়ের চামড়া, তবু তার কোন কষ্ট হয় না। মনের ভেতর দুঃখ থাকে না।

চোমানি—বলে ডাকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সে। স্বর বেরোয় না, গলাটা আশ্চর্যভাবে কাঁপে। বিস্ফারিত চোখ মেলে এ কী দেখছে সে!

তার ঐ ফাঁপা লাঠিটা দিয়ে বিলিতি কুকুরটাকে দমতক পেটাচ্ছিল চোমানি। ভয়ে জড়োসড়ো কুকুরটা বারান্দার এককোণে গিয়ে হাঁপাচ্ছে। কুকুরটার ডাক অবিকল চোমানির কান্নার মত শোনাচ্ছে।

বারান্দায় লম্ফঝম্ফ মেরে দুধের বাটিটা ফেলে দিয়েছে কুকুরটা। একটা দুধের নদ। বয়ে যাচ্ছে মেঝেতে। চোমানি কিছুতেই কুকুরটাকে ছাড়বে না। সে জোর করে দুধ খাওয়াবেই। তাতেই বিপদ হয়েছে অকস্মাৎ। বিলিতি কুকুরটা কামড়ে দিয়েছে চোমানির হাতে। ওপরে-নিচে কতকগুলো রক্তমুখ দাঁত। রক্তধারা তখনো অব্যাহত। সেই রাগে কুকুরটাকে বেধড়ক পেটাচ্ছিল চোমানি। লাঠিটা শক্ত হাতে আঁকড়ে হাঁপাচ্ছিল সে।

এ-সব দেখে কি ভেবে চোখে জল এল সামারুবুড়ার। তার মনে হল, লাঠি নয়, চোমানি যেন তার হাতটাই আঁকড়ে ধরেছে পরম নির্ভরতায়।

ভারতবর্ষ

চার পাঁচটা বগি নিয়ে কয়লার ইঞ্জিনটা থামতেই নিখিলেশের মনে হল জেমস ওয়াটের গাড়ির বয়স হয়েছে, এবার এর বিশ্রাম নেওয়া দরকার। বিশ্রামের পরই বিদায়। কিন্তু যেভাবে লোহার পাতে দাঁতের দাগ বসিয়ে গাড়িটা ছুটে এল তা দেখে রীতিমত বিস্মিত হল নিখিলেশ। গাড়িটা থেমে আছে কিন্তু শব্দগুলো টুকরো টুকরো হচ্ছিল বাতাসে।

বোলাংগীরের এই মনমরা স্টেশনটায় এখন খাঁ খাঁ রোদ, রাক্ষুসে চাহুনির সূর্য; সিগন্যালের ডগডগে লাল আলোগুলোর চেয়েও এই রোদ এখন বেশি চোখে লাগে। ইস্পাতের ঘস্টানিতে কেঁপে যাচ্ছিল চারপাশ। নিখিলেশ কেমন মনমরা হয়ে গাড়ির ইঞ্জিনের কাছে এগিয়ে এল। পুরনো আমলের স্টিম ইঞ্জিন। বয়লারের ভেতরে কাঁচা কয়লার রক্ত-আঁচ। হাওয়ায় কেঁপে যাচ্ছিল অগ্নিশিখা। মাঝে মাঝেই আগুন-জলের হুঙ্কার। হিস্‌হাস শব্দ। আগুনের নিঃশ্বাসে বাষ্পীয় ধোঁয়া। রেল লাইনের ওপর আছড়ে পড়ছে গরম জল। তার ধাক্কায় হেলে যাচ্ছে কচি ঘাস। দু-বেলাই এমন হয়।

নিখিলেশকে দেখতে পেয়ে ড্রাইভার হাসল। ভদ্রলোকের হাসিটা বেশ পরিচ্ছন্ন, ধারাল। ভাঙা ভাঙা ওড়িয়াতে বলল, উঠে আসুন মিত্রবাবু। আজ কোথায় প্রোগ্রাম ?

হাসির বিনিময়ে হাসি ফিরিয়ে দিল নিখিলেশ। ইঞ্জিনে উঠতে উঠতে বলল, বেশি দূর নয়। চার-পাঁচটা স্টেশন ঘুরেই ফিরে আসব। শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।

—কেন, কি হ'ল আবার ? ড্রাইভারের গলায় উদ্বেগ।

নিখিলেশ বলল, তেমন কিছু নয়। গতকাল রাতে বাথরুমে যেতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। তারপর, আর কিছু মনে নেই।···এই দেখুন, চোখের পাশটায় কেমন লেগেছে। আজ আইস ব্যাগ দিয়েছিলাম। এখন কিছুটা কম।

—প্রেসার কত ? হাই না লো ?

নিখিলেশ হয়ত শুনতে পায়নি। ফাঁকা মাঠ থেকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে আসছিল ঝাঁক ঝাঁক হাওয়া। থান কাপড়ে থোক থোক নীল বড়ির মত মেঘ। রোদের উজ্জ্বলতা যুবতী চোখের দৃষ্টির চেয়েও ধারাল, হাঁ করে এসবই দেখছিল সে। মাঝে মাঝে সে বড় আনমনা হয়ে যায়। ডিপার্টমেণ্টাল কাজের চাপ। সংসারের ঝামেলা। এসবের মাঝে দম ফেলার ফুরসত কোথায় ?

দিনকে দিন কাজের বোঝা বাড়ছে। ভাঙা থার্মোমিটারের পারদের মত কত যে টুকরো টুকরো কাজ। এর শুরু আছে কিন্তু শেষ কোথায়, তা সে নিজেও জানে না।

এই সামনের আগস্টে সে বাহান্ন ছোঁবে। বড় মেয়ের এক ছেলে এক মেয়ে। সঙ্গত আবদারে জুলফির কাছটায় রুপালী কুচিতে ভরে উঠেছে। সেভ করার সময় বড় চোখে বাঁধে।

স্টীম ইঞ্জিনের ড্রাইভার মাথায় রুমাল বেঁধে নিল। এটাই নিয়ম। গোছ গোছ চুল চাড় হয়ে বসে থাকল মাথায়। দূর থেকে মনেহয় নেড়া মাথা নয়ত খুলি। এ দৃশ্যটা নিখিলেশের খুব চেনা। বর্ধমানের বাড়িতে মা থাকেন। দেখাশোনার ভার দাদার। সে কেবল মাস গেলে কিছু টাকা পাঠায়। ছুটি নিয়ে দেখে আসবে তেমন সুযোগও নেই। সেকশনের দায়িত্বে থাকলে ছুটি পাওয়া আর চাঁদে যাওয়া একই কথা। প্রায় সপ্তাহে দাদার অভিমান চুবানো চিঠি আসে।

…নিখিল, হৈম ডাক্তার বলেছেন, মাকে রাঁচি নিয়ে যেতে। তুই তো বোকারোয় ছিলিস। একবার সময় করে আয় না। আমার মনেহয় রাঁচিতে নিয়ে গেলে মা হয়ত ভাল হয়ে যেত। ওখানে শুনেছি, ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট আছে।

যাব যাব করেও নিখিলেশের যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তার হাত পা নখ কান চোখ মুখ বিবেক বুদ্ধি ভদ্রতা সৌজন্যতা সব ফাইলের লাল সুতোয় বন্দী। মাঝে মধ্যে মায়ের মুখটা মনে ভাসে। রুগ্ন, কৃশ, হাড় সর্বস্ব মানুষ। আগে দুর্গা ঠাকুরের মত কোঁকড়ান চুল ছিল মাথায়, এখন চাঁছাছোলা। দূর থেকে দেখলে বড় আকারের বেল কিংবা কঙ্কাল করোটি। তাতে নীল শিরার পথ-প্রণালী।

ড্রাইভারের ঘিয়ে রঙের রুমালে কয়লা চূর্ণ। ওগুলো অপরিষ্কার হাতে ঝেড়ে নিয়ে হাসল। বেশ চালাক-চতুর হাসি। অথচ মুখ দেখে অনুমান করা যায় না ভদ্রলোক এত চালাক। চিবিয়ে চিবিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল অবলীলায়।

—বুঝলেন মিত্রবাবু ?

নিখিলেশ থতথত খাওয়া চোখে তাকাল। কিছু না বুঝতে পেরে চেয়েই থাকল।

—এবারের পে-কমিশন একেবারে ঝুলিয়ে দিল। নো বেনিফিট মশাই। খালি গালভারি গপ্পো—হ্যান দেব, ত্যান দেব। অথচ, দেবার বেলায় ফক্কা ! সিক্সটিন ইয়ারস্ সার্ভিসে মাত্র ছাপ্পান্ন টাকা বেনিফিট। ভাবুন তো কী দেশে আমরা বাস করছি ! নিখিলেশ ঠোঁট কামড়ে ধরল। কিছুটা আনমনা ; এসব

আর ভালো লাগে না তার। ডিপার্টমেন্টাল কথা-বার্তায় কানের শ্রবণশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। দুটো ভাল-মন্দ কথা নেই কেবল দেখা হলেই কটা ডি এ বাড়ল—কত টাকা এরিয়ার্স পাবে তারই চুলচেরা হিসাব-নিকাশ। টাকা-পয়সা সংক্রান্ত কথাবার্তাগুলো এখন তার অসহ্য লাগছে। এইড্স-এর জীবাণুর চেয়েও যেন ভয়ঙ্কর।

ফায়ার পেনুসে বেলচায় করে কয়লা ফেলে দিল ফায়ারম্যান। বয়স বেশী নয়, তবু দানবের মত চেহারা। শ্মশানের মুড়দার পোড়া ডোমগুলোর চেয়েও ঘোলাটে চোখ। কপালের ঘাম চেঁছে ফেলে দিতেই নড়ে উঠল গাড়ি, ঘর্ষণ উঠল চাকায়—কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার কুণ্ডলী হটিয়ে দাউ দাউ জ্বলে উঠল আগুন। কু-উ-উ-ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্। ছন্দের তালে তালে বিকট যান্ত্রিক শব্দ। ফুসফুসের ভেতর প্রাণবায়ু ঠেলে যেন বেরিয়ে আসার উপক্রম। নিখিলেশ খুব গাঢ় মনে শুনছিল। বয়লারের ভেতরটা মানুষের ভুখা পেট হয়ে জ্বলছে। ইঞ্জিনের শব্দ যেন নিঃশ্বাস টানার শব্দ। নিখিলেশের বুকের কাছটায় কেমন যেন কণ্ট হয়। আজ তার মনের অবস্থা ভাল নেই। রমা বারবার করে লাইনে বেরতে নিষেধ করেছিল। অথচ না বেরলে কোন উপায়ও নেই। মান্থলি ফিস্-প্লেট ইন্সপেকশনের রিপোর্টগুলো জমা দিতে হবে। ডিভিশন থেকে চাপ আসছে। শারীরিক অসুস্থতা সেখানে বালির বাঁধ। সবাই যে যার চাকরি সামলাতে ব্যস্ত। ফলে কখনও বা উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। তাই, সাবধানে থাকা। টেলিফোনের ফায়ারিং-এর ধকল, আততায়ীর স্টেনগানের গুলির মত ঝাঁঝরা করে দেয় ব্যক্তিসত্ত্বা। মরমে বড় লাগে। আর লাগে বলেই গত ক'দিন থেকে অ্যাবনর্ম্যাল প্রেসার। চেক-আপ করিয়েও কোন ফল হয়নি। ৫২ বছর বয়সটা যেন সবে বেরিয়ে আসা কচি কলাপাতা, হাওয়া দিলেই যখন তখন ফেঁসে যাওয়ার চান্স।

নিখিলেশ তাই কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি।

ছোট মেয়ে উমার এখনও বিয়ে বাকি! প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর আরবান ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে তাই দিয়ে কোনমতে পার হয়ে যাবে উমা। তবে, আর বেশি দেরি করা চলবে না। উমার যা বয়স তাতে আর বছর দেড়েকের মধ্যে পাত্রস্থ করতে না পারলে চৈত্র মাসের লাউ-এর মত কুৎসিৎ হয়ে যাবে মেয়েটা। সোনার বাংলায় মেয়েরা তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়! নিখিলেশ এই সিদ্ধান্তে এসে ফিল্ড বুকে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের পজিশন নোট করল। ট্রেন দুলছিল। ফলে কেঁপে কেঁপে গেল তার লেখা। কিছুটা যেতেই ব্রক সারকিটের ভাঙা ইনস্যুলেটরের কিলোমিটার নাম্বার নোট করল সে। হেড কোয়ার্টারে গিয়ে এসবের ডিটেলস্ রিপোর্ট দিতে হবে তাকে; এটাই রেয়াজ।

এই ফাঁকে সিগ্রেট ধরায় ড্রাইভার। দু-টান দিয়ে মুখ বেঁকিয়ে বলল, বুঝলেন, সিগারেটের আবার দাম বাড়ল। মুখে কিছু তোলার উপায় নেই, বুঝলেন? দেশটা গেল!

গলার ঝাঁঝ লুকিয়ে নিখিলেশ বলল, আপনি দেশের কথা ভাবেন?

—আলবাৎ ভাবি। কেন ভাবব না মশাই। দেশ কি আপনার একার? এই তো আজকের কাগজে দেখলাম, ওড়িশার কালাহাণ্ডি, কোরাপুট আর বোলাংগীরে মানুষ না খেতে পেয়ে ছারপোকার মত মরছে। বলুন তো, কি প্যাথেটিক! সরকার পক্ষ একেবারে চুপচাপ। নো কমেণ্টস্।

—খবরটা আমিও দেখেছি। টু-উ স্যাড। পড়তে গিয়ে বাজে লাগছিল। হাত কামড়ান ছাড়া কোন উপায় নেই।

—বুঝলেন, আসলে আমরা এক একটা ডল পুতুল। আমাদের প্রতিবাদের মুখ লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে আঁটা। আমরা এক একটা ঠুঁটো জগন্নাথ, বুঝলেন।

দশ কিলোমিটার আসার পরেই গাড়ি থামল। নিখিলেশের কপালের দু-পাশটা টন টন করছিল টেনশনে। আজকাল বেশি ভাবলেই বিষ দেওয়া পুকুরের সিলভার কাপ মাছের মত ধুকপুক করে প্রাণপাখি। ফায়ারম্যান নিচে নেমে গিয়ে চুট্টা কিনল। চুট্টাতে বিড়ির চেয়েও নেশা বেশি। মতিহার গুণ্ডি দেওয়া পানের চেয়েও চুট্টার দাম কম। এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে নাকি উপকারী। খেলে মেজাজ হয়, স্ট্যাটাস বাড়ে। চুরুটের ভায়রাভাই। এতক্ষণ হাত নেড়ে এসবই বোঝাচ্ছিল ছোকরাটা।

নিখিলেশ তবু চুপচাপ। প্রায় পাঁচশ'র ওপরে লোক মারা গেছে অনাহারে। নিউজপ্রিণ্টে গলিত শবের গন্ধ। কাগজটা হাতে তুলে নিতেও ভয়। চাপা ক্রোধ, কান্না আর অভিমানে ভরা কালো হরফ। যেন প্রতিটি বাক্যে এক একটা মানুষের নিঃশ্বাস। হাত-পা ছেঁড়া যন্ত্রণা, অব্যক্ত নীরব চাহুনি। কোথায় পালাবে সে? যেখানেই যাক সেই একই গুহায় ফিরে আসতে হবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে।

খাওয়ার পরই দাদার ইনল্যাণ্ড লেটারটা পিওন দিয়ে গেল সাইকেলের বেল বাজিয়ে।...মা আমার একার নয়। তোকেও দশ দিন দশ মাস গর্ভে ধারণ করেছেন। মায়ের এই শেষ সময়ে তোর একবার আসা উচিত। তুই কী এমন নবাব-ব্যারিস্টারের চাকরি করিস যাতে দশদিন ছুটি পাস না!

মায়ের কথা মনে পড়লে এই বয়সেও সে কেমন দুর্বল হয়ে পড়ে! ছোট-বেলায় বাবাকে হারিয়ে মা তার কাছে অক্সিজেন, জল। অথচ জলের কাছে যাওয়া হয় না! রাহুল সাহেব বলেছেন, এখন প্রি-মনসুন চেক আপ। প্লাস ইন্সপেকশন। নাউ নো লিভ অ্যাট অল।

ওড়িশার হা-ভাতে, হাড় জিরজিরে গ্রামগুলো ছুঁয়ে ট্রেন যাচ্ছে, দুপাশে ছোট-বড় পাহাড়, জলাভূমি, অরণ্য। খরায় আঁইঢাই করছে চারপাশ। বৈশাখের শেষাশেষিতে একফোঁটা জলের দেখা নেই। রুখু-সুখু গ্রাম রূপকথার ডাইনি বুড়ির শন চুলের মত কদর্য। তাতে ঝলসে যাচ্ছে সূর্য-কিরণ। সরু আলপথ ধরে জলের সন্ধানে শুখা পথ ভাঙছে হাঁটুর কাছাকাছি পেঁচিয়ে কাপড় পরা মেয়েগুলো। আকাশের হ্যাট্রিট্রি-ই-ই পাখির চেয়েও চঞ্চল তাদের চোখের তারা।

ট্রেনটা আবার থামল। স্টেশনটা বড় নয়, মাঝারি। এখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ লাইন সোজা রায়পুরের দিকে চলে গেছে। ড্রাইভার বলল, ক্রসিং আছে। জল খেতে হলে চট করে খেয়ে আসুন। সামনেই কল।

নামতে যাচ্ছিল নিখিলেশ। কিন্তু নামতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল সে। তার দিকে মুখ করে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে একটি মেয়ে। এত রুগ্ন যেন হাড়-পাঁজরা সব গোনা যায়। মলিন মুখটায় অপুষ্টির ধূসর প্রলেপ। মেচেতার দাগকে চাপা দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সর্বগ্রাসী অভাব। বয়স অনুমান করা দুরূহ। ২১ হতে পারে, আবার ৪১-ও হতে পারে। পরনে শতচ্ছিন্ন একটা কাপড়। গায়ে কোন জামার বালাই নেই, ফলে পচা লাউজালির মত শুকনো দুই বুক ভেজা নেতার মত লেপটে আছে চামে। শীর্ণ দু-হাত বাড়িয়ে মেয়েটা যেন কিছু ভিক্ষা চাইছে। তার চোখের হলুদ জমিতে ভিক্ষা-বৃত্তির প্রচ্ছন্ন ছায়া।

নিখিলেশের কেমন মায়া হল। মেয়েটির হাতের টোল খাওয়া বাটিটার মত খরায় তুবড়ে আছে ধরিত্রী। চারদিক এত রুক্ষ তবু এই রুক্ষতার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পায় সে। কাগজে যা পড়েছে তা সত্যি। কাতারে কাতারে মানুষ মরছে। দুমুঠো খাদ্যের জন্য ছেলে-বৌকেও বন্ধক রাখতে রাজি। খরার সাথে ছোবল মারছে অসুখ। অপুষ্টি অনাহারের অসুখ। বাতাসে ঘোর আকালের তপ্ত নিঃশ্বাস। কড়া পড়া হাড় জিরজিরে নেগেটিভের চেয়েও কালো কালো শরীরগুলোয় এখন প্রভূত তাপ। যেন এক একটা শরীর তাপের উৎস। স্বাস্থ্যবিশারদরা বলছেন, মস্তিষ্কের জ্বর। এত মানুষের মৃত্যুর কারণ মস্তিষ্ক জ্বর? হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে।

মেয়েটা সাহসে ভর দিয়ে নিখিলেশের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে তোবড়ান অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটা। কি চায়? ভিক্ষা, সাহায্য? নিশ্চয়ই লাখানার আশপাশের কোন গ্রাম থেকে সে ছুটে এসেছে এখানে। হয়ত রোজই আসে। এটাই তার অভ্যাস। তবে কি বোলাংগীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও অনাহার

অপুষ্টির মৃত্যুথাবা ? কেমন শিহরিত হয়ে ওঠে সে। ভয়ার্ত গলায় নিখিলেশ শুধোয়, কি চাই তোমার ?

মেয়েটা জবাব দেয় না। বোবা চোখে তাকিয়ে কেবল তোবড়ান বাটিটা এগিয়ে দেয় সামনে। তা দেওয়া মুরগির চেয়েও শান্ত টলটলে দু'চোখ। চোখ জুড়ে আশা, বিশ্বাস। বোঝা যায় এ মেয়ের গায়ে এখনও রেল স্টেশনের ময়লা লাগেনি।

দয়াবশত একটা কাঁচা টাকা পকেট থেকে বের করে আনে নিখিলেশ। মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিতেই সঙ্কোচে দু-পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা। টাকা চায় না সে। তাহলে, কি চায় ? নিখিলেশ অবাক। কুণ্ঠিত গলায় বলল, আরে নাও। আমি খুশি হয়ে দিচ্ছি।

—আমি লিবোনি বাবু। আমি পয়সা মাঙতে আসিনি।

—তাহলে ?

মেয়েটা স্টিম ইঞ্জিনের দিকে হাপুস চোখে তাকিয়ে থাকে। অপলক চোখের চাহনি। দেখতে দেখতে কেমন বিভোর হয়ে যায় সে। মস্ত বড় ইঞ্জিন। কত শক্তি তার ! দেবতা ভিন্ন অমন শক্তি কারোর হয় ? সে যেন দেব-দর্শনে এসেছে, হাতজোড় করে বিড়বিড়িয়ে ওঠে, আমায় এট্টু ইঞ্জিন জল দেন গো বাবু। বড্ড দরকার।

—ইঞ্জিন জল ?

—হ বাবু। আমার খোকাটার বুকের ব্যামো। কাশলে পরে রক্ত বেরোয় মুখ থেকে। কিছুতেই ভাল হয়নি—। এ জল ওরে খাওয়াতাম।

—এই জল খাওয়াবে ?

—হ বাবু। এযে দেবতার জল ! গাঁ-বুড়া বলে, এ জল খেলে রোগজ্বালা সব ভাল হয়। আমায় এট্টু দেন বাবু···। বহুদূর থেকে আসছি।

পোড়া ঝলসানো মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে নিখিলেশ। বিশ্বাসে বুঁদ হয়ে আছে মেয়েটার মাতৃ-হৃদয়। কি বলবে ? ফিরিয়ে দেবে কি ? বুঝিয়ে বলবে কি, এ জল খেলে রোগ ভাল হয় না, মা। তুমি ফিরে যাও। হাসপাতালে দেখাও। তোমার ছেলের টিবি হয়েছে। ওর চিকিৎসার দরকার। দরকার ভাল ভাল পথ্য আর বিশ্রামের। বলতে গিয়েও বলতে পারে না নিখিলেশ। তার মনে হয়, সে এক মহাশূন্যে দাঁড়িয়ে আছে এখন। বিরাট শূন্যতা তার সামনে। এই শূন্যতার ভৌগোলিক অবস্থান কোথায় ? এ কোথায় এল সে ? এ কি সেই প্রতিদিনের চেনা বোলাংগীরের লাখানা যেখান হয়ে প্রতিমাসে বেশ কয়েকবার তাকে যেতে হয় রুটির জন্য, পেটের জন্য !

মেয়েটা যেন দাতাকর্ণের কাছে ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে দিয়েছে। কেমন নির্ভরশীল

চোখ-মুখ। আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে সে এখন ইঞ্জিনের খুব কাছাকাছি। যেন দেব-দর্শনে এসেছে, দেবতার অনুগ্রহ তাকে যে করেই হোক পেতেই হবে।

স্মৃতিতে ভর দিয়ে নিজের ভেতরে হামাগুড়ি দেয় নিখিলেশ। করকর করে চোখের দৃষ্টি, বুকের ভেতর কষ্টের ব্যাঙটা লাফায়। বি এ পাশ করে বড়দা তখনও বেকার। সে নিজে স্কুলের শেষ গন্ডিতে। ঠিক পরীক্ষার মুখে টাইফয়েড-এ পড়ল সে। দেড়মাস ধরে যমে-মানুষে টানাটানি। ছেলের আরোগ্যের জন্য ছ'ক্রোশ পথ ভেঙে তার মা তুলে এনেছিল বামুন পুকুরের জল। সন্ধ্যা-সকালে সেই জল এক রকম বাধ্যতামূলক খেতে হ'ত নিখিলেশকে।

পৃথিবীর সব মা-ই একরকম। চোখকে শাসন করল নিখিলেশ। ড্রাইভারকে বুঝিয়ে বলাতে একচোট গলা ফাটিয়ে হাসল। তারপর, একসময় চোখে-মুখে ক্রূরতা ফুটিয়ে বলল, এসব ভ্যানতাড়া। ছাড়ুন তো মশাই, ওদের মোটে পাত্তা দেবেন না। একেবারে পাক্কা ছোটলোক। একটু ফাঁক পেলেই কয়লার চাঁই তুলে নিয়ে পালাবে।

মেয়েটা তখনও আশার চোখে তাকিয়ে। এই খরা-পোড়ার মরসুমে কেবল ওর চোখ দুটোই সজল। বহু অনুরোধে ফায়ারম্যান, চুঁইয়ে নামা গরম জলের পাইপটা এগিয়ে দিল সামনে। মেয়েটা উবু হয়ে ধরে নিল সেই জল। যেন সমুদ্র-মন্থনের অমৃত এখন তার কবজায়।

মস্তিষ্ক জ্বরের কোন ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে খবরের কাগজ এবং উচ্চ স্তরের আমলাদের জোর বাক-বিতণ্ডা। কালাহাণ্ডি, কোরাপুট এবং বোলাংগীরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন খরা। হাহাকার এবং অনাহার।

গাড়িটা ছেড়ে দিতেই চারদিক ঝাপসা দেখছিল নিখিলেশ। স্বাধীনতার পরে এই প্রথম সে বুঝতে পারল, এতদিন তার চোখে একটা রঙিন চশমা ছিল। চশমাটা ভেঙে যাওয়াতে চারদিক ভয়ানক রকমের ঝাপসা দেখছে সে।

অনুপ সিংহ

ঘর বাঁধা

তুমার জেবনটা শ্যা-কুলের কাঁটাপারা!
বউয়ের মন্তব্যটা মদনের মনটাকে জেরবার করে বেচে দিয়েছে বিকিকিনির হাটে। তার জীবনসুধা, শুষ্ক, বেরসিক, মরুভূমির মত। সব রস বাষ্পীভূত হয়েছে চোতের খর রোদের তাপে। বিতৃষ্ণা ধরে গেছে তার এ-অভাগা জীবনটার উপর। অকাল খরা এসে যেন যৌবনটাকে মরুভূমি করে দিল। পায়ের নিচে ভূমি তাড়িত হয়ে সে আজ ভবঘুরে। পাড়ার লোকে ছড়া কেটে বলে, বৌ পালানো মদনেশ্বর/ যাবে এবার ভুবনেশ্বর। এ-কথা শুনেও মদন কোন উত্তর করে না—রা কাড়ে না। যে যা বলবে বলুক গে, তাতে আমার কী যায়-আসে। এরকম ভাব করে ঘোরে-ফেরে। পাড়ার মেয়েরা ভাবে—মদনের যৌবন, মরা হাটের আনাজ-পাতি। তা না হলে, অমন সুন্দরী রস ভরা যুবতী বউ ঘর ছেড়ে পালায়! তাই কেউ অনুরাগের নজরে দেখেনা তাকে।

কেউ না দেখলে কী হবে? খুদু দেখে। খুদুর মরুভূমি বুকে মদন রস শেকড় বিস্তার করে কাঁটাগাছের মত। এ-গাছ গুলো মরুভূমির আসল রসের খবর রাখে। অন্য সব হা-রসে গাছের মত বুক থাবড়ানো, ধাতে সয় না তাদের। কাঁটা উঁচু করে বালি-লেহন-করা বাতাসকে বলে, আমরা বেঁচে আছি। আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে আকাশকে বলে, আকাশ তুমি নিচে নেমে এসো। উলঙ্গ নীল আকাশ লজ্জা পেয়ে যেন মেঘ দিয়ে গতর ঢাকে। দিগন্ত রেখায় ছড়িয়ে পড়ে কামনার শুভদৃষ্টি। দিগন্তরেখা ধরে ধরে সে খবর পেঁছায় আকাশের কাছে, নীল আকাশ সান্ত্বনা দেয়, আমি আছি—আমি তোমার চিরকালের আচ্ছাদন।

স্বামী পরিত্যক্তা খুদুর যৌবন যেন সারগাদার খড়কুটো! গলে পচে সৃষ্টি করে অন্য রস। জীবন রস। সে-রসের সন্ধান পেয়ে অভিজ্ঞ চাষীর মত রসের সার ছিটিয়ে দেয় ভূমির ওপর। ভূমি রসবতী হয়। তার কোমল বুক-জোড়া কুসুম উষ্ণতায় স্নান করে স্তনবৃন্তে কম্পন জাগায়। বাতাসে রিন্ রিন্ শব্দ হলে সেই কম্পন বার্তা পেঁছে যায় মদনের বুকের পাঁজরায়, মনে, হৃদয়ে। মদন এখন মরুভূমির বুকে বাতাসে বাতাসে খেলা করা কাঁটা গাছ। শুষ্ক রস ভূমি থেকে শুষে নিয়ে পেঁছে দেয় কাঁটায় কাঁটায়। সে-রস বাষ্প হয়ে ওড়ে, সুধা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে ভর করে। বাতাসের জলকণা

বহন ক্ষমতা নাকি গাধার ছেঁচাক বহন ক্ষমতার মত। সেই বাষ্প রস তাই সুধা-বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে ভূমি-রূপিনী খদ্দের যৌবন-স্নাত কোষ-কোষান্তরে।

গেল হাটের উদ্বেগ, উত্তেজনা, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা প্রেম হয়ে বুকে বাজে আজ—আজকের হাটে। নির্ঝর প্রেম-মৌতাত, উথাল-পাতাল কামনার ঢেউ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আশায় বুক বাঁধে মদন। সে ফি-হাটেই আসে-যায়। বেচে আলু, পেঁয়াজ, আদা, লংকা, বেগুন! রকমারি সব মরসুমি তরিতরকারি। এ-সবই সে মহাজনের আড়ত থেকে নিয়ে আসে সওদা করে। পনেরো বছরের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ তার ব্যবসা জীবন। আলু পেঁয়াজ, আদা দেখেই সে বলে দিতে পারে এ সবের গুণাগুণ—অভিজ্ঞ জহুরীর মত। আজকাল মালাইচাকি উদোম করা ধুতি পরা ঠাকুরদার মত হাটটা খাঁ খাঁ করে। দেখে দেখে মদনের বুকের ভেতরটা কেমন ফোঁপরা হয়ে যায়। ফোঁপরা হবার কথাই বলেন মহাজন—বুঝলে মদন, আলু-পেঁয়াজ মন প্রতি কুড়ি টাকা, আদা চল্লিশ টাকা বেশি দাম লাগবে। মহাজন গোঁফের ফাঁকে মিচকে হেসে বলেন এসব কথা।

মদন সুধায়, ক্যানে বাবু ? গেল হাটেও তো পুরনো দরেই মাল তুলেচি।

মহাজন কপট স্বরে বলে, ওরে হতচ্ছাড়া, তাও জানিস না! সরকার পেট্রোলের দাম বাড়াচ্ছে, বাসের ভাড়া বাড়াচ্ছে—সমস্ত জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। কথাটা যেন বুঝতে পারে সে! জিনিসের দাম স্বাধীনতার বছরের পর থেকেই বাচ্চা ছেলেদের বুড়ি ছোঁয়া খেলা। চু-উ-উ কিত্ কিত্……।

এককালে এই আলু-পেঁয়াজ বেচেছে টাকায় দু'কিলো, তিন কিলো দরে। এখন আর কেউই কিলোতে দাম হাঁকে না। জিনিস বিক্রি হয় এক টাকা, দু'টাকা পোয়া দরে। কিলোতে দর হাঁকলে খদ্দেরের বুকের ভেতরে কাঁটা বিঁধে যায়। মদন তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় হাটুরে লোকের ব্যথার ক্ষতস্থান চিনে ফেলেছে। অভিজ্ঞ ডাক্তার যেরকম বলেন, ক্যানসার হয়ে গেছে, কেটে ফেলা ছাড়া উপায় দেখছি না। মদনও সেরকম তার মত সওদা করা আর পাঁচটা বন্ধু-বান্ধবকে বলে, দাদা সকল! কিলো ভুলে যাও—ছেঁটে ফ্যালো। পো'তে দর হাঁকো। নইলে খদ্দের ভয় খেয়ে খালি ব্যাগে ঘর যাবে। ভগবানের দেয়া জল গিলে হাটিয়ার গলার কাঁটা নামাবে।

বন্ধুরা হাততালি দিয়ে বলে, মদন মাষ্টারের বুদ্ধি তারিফ করার মতন বটে! মদন এ-ব্যাপারে হাটে সওদা করা মানুষগুলোর মাষ্টারই বটে। তারপর থেকে সকলেই দর হাঁকে, এক টাকা, দু'টাকা, তিন টাকা পো……।

খুদু লোক মুখে মানুষটার কথা খুব শুনেছে। হৃদয়টা তার নেচে ওঠে বাতাসে বাতাসে কথা আদান-প্রদান করা গাছের কাঁপুনির মত। চোখের পাতা থির থির করে কাঁপে। পাতার কাঁপুনি তোলে শিরায় শিরায়। গত কয়েকটা হাটে তাকে দেখে প্রেম-বীজ উপ্ত হয়েছে খুদুর মনের আঙিনায়। গত হাটে যা ছিল শুধু একটা বীজমাত্র, এ হাটে তা প্রেমলতা হয়ে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে। লাউডগার মত আঁকশি বিস্তার করে একের পর এক। পশ্চিম আকাশের কোলে পাটে বসা সূর্য দিগন্তরেখায় সিঁদুরে আলো ছড়িয়ে দেয়। শারদ মেঘের চঞ্চল স্তর গোধূলি আলোকে অগ্নিস্নান করে দিন-শেষের পাখিরা কলরবে সরব। বিরহকাতর ভঙ্গিতে তারা ফিরে যায় আপন আপন নীড়ে। দিনের আলো তরল হতে হতে অন্ধকার আহ্বান জানায় আগত রাতকে…সন্ধ্যা নামে।

হাট ফিরতি ঘরমুখো ব্যস্ত-শ্রান্ত মানুষগুলো জনরোল তোলে খেয়াঘাট চত্বরে। খেয়ার মাঝি তখন নদীর ওপারে খেয়া পারাপারে ব্যস্ত। নদীর জলতরঙ্গ কুলকুল ছুটে চলে স্রোতের অনুকূলে। খেয়াঘাটের নিমতলায় দুটো মানুষ-মানুষীর হৃদয়ে তখন ঢেউয়ের উথালি পাথালি। যেন নিঃশব্দ আদান-প্রদানের ব্যাপারী! নির্নিমেষ তাদের পলক। খুদুর বুকের মধ্যে তখন দুরু দুরু কাঁপনে অনুরাগের সাজি! ভালবাসার শিহরণে বিহ্বল চোখের পাতা। চোখ নয় যেন ডাগর কালো কুয়োতলার জমিন, নিপুণ শিল্পীর আঁকা জোড়া ভ্রু। দক্ষ ভাস্করের খোদাই করা চিকন নাক। কমলালেবু কোয়াপারা রাঙা ঠোঁট। তার কামাতুর পেলব মুখমণ্ডল বাতাসের তরঙ্গে খবর ছড়িয়ে দেয়—আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু দু'জনের মুখেই কোন কথা নেই। শুধুই নীরবতা। নীরব দৃষ্টি বিনিময়। তরল অন্ধকারে দৃষ্টির আঁকশি মেলে খুদু তার বুকের তরঙ্গ বিনিময় করে, মৃদুস্বরে অজান্তেই শুধোয়, কত্তা?

—হুঁ। শুকনো পাতার উপর এক ফোঁটা মধু টুপ্ করে পড়ল যেন!

—কত্তা! ঘর বাঁধবানা!

—গরীব-গুরবো মানুষের আবার ঘরবাঁধা? মাটির ঘর বানের তোড়ে ঝুর্ ঝুর্ করে খসে পড়ে—টাকা নাই যার, ঘর নাই তার। বুঝলে খুদু-রাণী।

খুদুরাণী! খুদুর বুকের ভেতরটা উলসে উঠলো যেন!

—ক্যানে? টাকাতে কি ভালবাসা কেনা যায়?

—যায় গো যায়। টাকা হচ্চে ঘি মাখনের মত নরম বস্তু। অর্থ না থাকলেই বুকে শ্যা-কুলের কাঁটা বিঁধবে—আমার মতন। বুঝলে রাণী।

—তুমার হেঁয়ালি কতা আমি বুঝতে নারি বাপু। একটু খোলসা করেই বলোনা ক্যানে ব্যথাটা কিসের !

—ধুস্ ! এ-কি গা-গতরের ব্যথা নাকি ! হাঁটুতে ব্যথা, সোজা কথায় বললাম, হাঁটুতে ব্যথা, বুকে ব্যথা—

—হি-হি-হি ! নিমগাছের পাতা কাঁপানো লাজুক হাসি জলতরঙ্গের সুরের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ঠিক তখনই নদীপাড়ের আকাশে একটা হাট্-টি-টি পাখি ডেকে ওটে, হা-টিট্-টি-টি-টি।

শব্দটা মদনের কানে যেন ভেসে আসল, ভা-ল্-ল-বা-সি।

মাঝ নদীতে মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালি গানের সুরেলা বাতাস নদীপাড়ে ঘরে ফেরার বাতাস বয়ে আনে। ঘরে ফেরার সুর ঘরবাঁধার আবেগ সৃষ্টি করে নিমগাছের নিচে দাঁড়ানো দুটো নর-নারীর বুকের খাঁচায়। অতীত ভাবনায় ডুবে যায় তারা।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরলো, খুদু শ্বশুর ভিটা ছেড়েছে। স্বামী কানাই শহর থেকে বউ নিয়ে ফিরে আসে রিক্শা করে। সে মেয়ের সদর দরজা কাঁপানো, বুক চিতনো হাঁটায় রাজ্য জয়ের ভঙ্গিমা। পায়ে তার হাওয়াই চটি। নাকে নোলক। গা-ভরা রোলগোল্ডের গয়নার দেমাক। স্থূল দেহে সদ্য যৌবনে পা-রাখা গরব। ব্লাউজ ম্যাচ করা পাছা পেড়ে আঁটো পাকা তেলাকুচো রঙা শাড়িতে ফুল-পাপড়ি যৌবন প্রস্ফুটিত। শয্যা দখলকারী, সুখ ভোগকারী, লোভাতুর চাহনিতে চতুরতার ছোঁয়া। নক্লি রঙের লাল ঠোঁটে পুরুষ খ্যাপানো আকর্ষণ।

নীরবে এ-সবই সহ্য করে খুদু। শুধু সহ্য করতে পারেনি শয্যার একতরফা অধিকারকে। এক খাটে শুয়ে, এক মেয়েমানুষের সামনে একজন পুরুষ মানুষ সম্ভোগ করবে অপর একটি মেয়েকে—রাতের পর রাত এটা সহ্য করা মেয়েদের পক্ষে বড় কঠিন। কানাইয়ের মনে তখন ভাদরের ভরা নদীর জোয়ার। দেখে দেখে খুদুর মন একেবারেই বিষিয়ে গেছে। ভেঙে গেছে চোত মাসে ফেটে যাওয়া মাটির মত। তাই সে মনে মনে ভাবে, পুরুষ জাতটাই বেইমান ! কানাইয়ের চলনে-বলনে নেশাতুর ভাব। যেন বুঁদ হয়ে আছে দেওয়ালি পোকার নেশায় ! আবার, কাব্য করে শোনায়, প্রত্যেক পুন্নিমাতেই এক-একরকম চাঁদ দেখবো, তবেই না চাঁদ দেখায় মজা ! উত্তরে খুদু বলে, ম্যায়ি-মানুষের সাথে মরদের ফুল-প্রজাপতির সম্পক্ক। তা,

প্রজাপতিই যখন উড়ে গ্যাছে ফুলের রেণু তো বর্ষার জলে ধুয়ে যাবেই। এমনি করেই শুরু মন-কাটাকাটি খেলা। একদিন কানাই রাগে গর গর করতে করতে বলে, তবে তোর এ-বাড়ির ভাত উঠলো। যা, বেরিয়ে যা বলছি। গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় খুদুকে। বাঁজা মেয়ে মানুষের আবার সোয়ামীর ঘর করার সখ ক্যানে! দূর হয়ে যা যেদিক পানে যেতে চায় দু চোক, যা—। উড়ন্ত প্রজাপতি নিয়ে ঘর করতে পারেনি খুদু। তাই শ্বশুর-ঘর ছেড়ে সেদিনই চলে এসেছিল সে। তারপর থেকে তার জীবন-রেণু বর্ষার জলে ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে বউ-পালানো মদন এখন ডানা ভাঙা প্রজাপতি। ভাঙা ঘরে পুরুষ মানুষের মনে স্ফূর্তি থাকে না। পেট আছে তাই হাটবারে সওদা করা। মদন লোকমুখে শুনেছে, কলাবতী-বউ ঘর পালিয়ে এখন নাকি শহরের রাণী-মৌমাছি। মধুচক্র ব্যবসা খুলেছে। আজ এ-গাছে বাসা বাঁধে, আবার কিছু-দিন বাদে অন্য গাছে। তাই এখন তার বৌয়ের উপর কোন টান নেই। তার মনের মাঝখানে কেউ যেন বাঁধ বেঁধেছে। সে বাঁধ ভাঙার মত জলস্রোত দু' বছরেও আসেনি তার জীবনে।

আজকের খেয়াঘাটে সে-বাঁধে ফাটল ধরিয়ে দেয় খুদু। পুরুষের সুপ্ত প্রেমে ঘা খেয়ে একটা তরঙ্গ খেলে যায় মদনের বুকের ভিতর। ডানা ভাঙা প্রজাপতির বুকে ফুলের মধু খাওয়ার স্বপ্ন! নেশাকাতর বিভোরতা আর বিহ্বলতা। স্বপ্ন, বিভোরতা, বিহ্বলতার নেশাপ্রলেপ কম্পন জাগায় ফুলের রেণুতে-রেণুতে। বাবুবাড়িতে ঝি-গিরি করে বাড়ি ফেরতা খুদুর মনে আজ ভালবাসার আবেশ খেলা করে। সে আবেশে বিভোর হয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। দু'মাস হয়ে গেল, মানুষটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল খেয়াঘাটে। বাবুবাড়ির হাট করতে যেতে হয় তাকে। সে-দিনের পর অসুখের অছিলায় হাটে যাওয়া বন্ধ করেছে সে। বাবুগিন্নি বলেন, দ্যাখ্ খুদু, আজকাল তোর কাজে ভীষণ অমনোযোগ। দু'মাস হ'ল হাটে যাওয়াও বন্ধ করেছিস্। বাসন-কোসনে নোংরা থাকছে নিত্যদিন। বাসি ঘর ঝাট্ দিলেও মেঝে ধুলো-বালিতে একশা হয়ে থাকে। কাজে যখন তোর এতই অবহেলা, তখন আমাকে এবারে অন্য ঝি দেখতে হচ্ছে।

—না-গিন্নিমা-না! আমাকে কাজ ছাড়িয়ে দিবেন না। কাজের মধ্যেই আমার সারাদিনের আশ্রয় মা।

আবার হাটে যেতে শুরু করে খুদু। আজ পূর্ণিমা রাতে মদনের ছায়া

পড়ে খেয়াঘাটের জলে। পরনে আলুথালু করে জড়ানো লুঙ্গি। গায়ে হলদেটে ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথার চুল উসকো-খুসকো হয়ে বাতাসে উড়ছে। পাশে সওদা করা জিনিসপাতির আধখালি ঝুড়ি। উদাস নয়নে জলের মধ্যে চাঁদের ছায়ারূপ দেখে সে। ভাবতে ভাবতে পেঁছে যায় হারানো দিনের সেই সময় গুলোতে, যখন স্বামী-স্ত্রীর সংসার ছিল—দু'জনের মনের মত ঘর ছিল। সুখ, স্বস্তি ছিল। হঠাৎ একটা নারীমূর্তির ছায়া পড়ে জলে, তার মনের উদাস ভাবটা তখনই কেটে যায়। আঁতকে উঠে আর্ত চিৎকার করে সে, কে—কে? তুমি!

—আমি গো, আমি। আমি যে তুমার খুদুরাণী!

—নাঃ, তুমি আমার কেউ না। তুমিও সুখের পায়রা। আমার সুখ নাই, আমার সুখপায়রা উড়ে গ্যাছে—হুই আকাশে।

—না-গো-না, আমি আজ উড়তে আসিনি। আমি আজ ফুল হয়ে এসেছি তুমার বুকে ফুটবো বলে। বুকে হাত দিয়ে দ্যাখো—আমার বুক-ভরা মধু।

খুদু মদনের ডান হাতটা আলগোছে টেনে আনে তার বুকের কাছে। মদন মুহূর্তে দিশেহারা হয়ে প্রজাপতিপারা পাখা ঝাপটায়। গভীর আলিঙ্গনে খুদুকে বুকের সাথে টেনে ধরে। অধরে এঁকে দেয় মিথুন রাগের চুম্বন।

—এ কি! তুমি নেশা কর! মদ খেয়েছ! ছিঃ! ছিঃ ছিঃ!

—দুঃ-শালা! যার মধু খাওয়ার মৌচাক নাই সে আবার মদ খাবে না তো কি? মধু পাবে কোথায়? কে দেবে মধু তাকে?

—যদি আমি দি?

কথাটা শুনে আত্মহারা হয়ে যায় মদন। তার বুকের ভেতরটায় কে যেন একটানা ঢাক বাজিয়ে চলে। দিশাহারা হয়ে সে বলে ফেলে, চলো রাণী! চলো ভেসে যাই নদীর বুকে—শুধু দুজনে।

এ যেন খুদুর কাছে মেঘ না চাইতেই জল পাওয়ার সামিল। তাই সে মৌন থেকেই নীরব সম্মতি জানায়। দুটো নর-নারীর বুকের মধ্যে বয়ে যায় এক অনাবিল আনন্দের স্রোত। তারা ফুল-প্রজাপতি হয়ে ভেসে চলে স্রোতের তোড়ে, ভাবনার স্বপনে। সে-স্রোত কলতান ভুলে কে যেন গেয়ে উঠল,—ভালবাসার অপর নামই স্রোত। এ যেন খরস্রোতা নদীর ভাঙন-খেলা। নদীর এক পাড় ভাঙলে অপর পাড়ে গড়ে ওঠে উর্বর চরভূমি। ভালবাসার স্রোতে গড়ে তোলে ঘর বাঁধার উর্বর জমিন। —এ খেলার নামই কি ঘর বাঁধা?

পরাণ

ঝিঙেফুল ফোটা রাতটা শিকারি মাকড়সার মত ও‍ঁত পেতে ছিল।

বর্ষা-শরৎ গেল, হেমন্ত সাবাড় হয়ে শীত এল। একমাত্র ছেলের মৃত্যু-শোক পরাণের বুকে পাথর চাপা হয়ে লেপটে আছে। শীত হাওয়ায়, সকালে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে, হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে দাওয়ায় বসে আছে সে—চোখ বুঁজে। চোখ বুঁজলেই সাপ দেখে! অন্ধকারের মধ্যে শুধু কালো কালো আল-কেউটে সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন! নীল আকাশের দিকে তাকাবে? একটু বাদে নীল আকাশটাও কালো হয়ে যায়, সে-আকাশে শুধু আল-কেউটে সাপ ঘোরে ফেরে, সে দেখে! সাপ ছাড়া আর কিছুই সে আজকাল দেখতে পায় না! জলজ্যান্ত ছেলেটাকে সাপে কাটার পর থেকেই এরকমটি হয় তার। বুকের মধ্যে হাঁপ ধরে, হাপর চলে—হৃৎপিণ্ড ধুপ্‌পুক্‌ করে। কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটাচ্ছে বুকের ভিতরে। এরকম হলে, কপালের চার-ইঞ্চি পরিমাণ পোড়া দাগটায় একনাগাড়ে হাত বোলায় পরাণ।

সাত সকালে কাঁথ-দেওয়ালটায় নোদা (গোবর মোড়ান পাটকাঠি) সাজাচ্ছিল সতী, অক্ষরজ্ঞানহীন সে। চোত-বোশেখে চড়া পড়া মরা ভৈরব নদের মত বুকটা তার শুকিয়ে এখন মরুভূমি! কাঁথ-দেওয়ালের নোদাগুলোও যেন হা-হা ক'রে হাসছে তার দিকে চেয়ে। দু'দিন বাদে যারা শুকিয়ে কাঠ হবে; উনুনে জ্বলবে ধিকিধিকি, শেষে ছাই হয়ে মিশে যাবে মাটির বুকে—সে-নোদাগুলোকে ঈর্ষা করে সে। ঈর্ষায় তাকাতে পারে না ও গুলোর দিকে, ডানে বাঁয়ে চোখ রাখে কাজের মাঝে। হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে থাকা পরাণের দিকে চোখ পড়তেই তার বুকের মধ্যে হাহাকার করে ওঠে। মানুষটা যেন ষাঁড়া-তালগাছের মত হয়ে গেছে আজকাল! ধাওড়া পাড়ার রামুসর্দার যে-গাছগুলোর কেশর কেটে হাঁড়ি পাতে, সে-গাছে তাল ধরে না। হাঁড়ির ভিতরের গ‍ঁজরা তালরস মাতাল করে, কিন্তু জন্ম দিতে পারে না আর একটা তালগাছের।

পরাণের সামনে, উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় সতী।

—কিছু খাবো?

—কী আর খাব—খেতে আমার ইচ্ছা যায় না রে…

—আমার পানে চেয়ে দ্যাখো—

হাঁটুর ফাঁক থেকে মুখ তোলে পরাণ। সতীর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতে পারে না সে, মাটির দিকে মুখ নামায়।

—হাসপাতালের ডাক্‌তারবাবু রগ-কাটা করে ষাঁড়া-মানুষ করে দিলে,

আমাকে কেউ আর বাপ বলে ডাকবে না! তোর পানে চাইতে পারিনে রে! গলা ধরে আসে পরাণের। সতী এগিয়ে এসে তার মাথায় সান্ত্বনার হাত রাখে, তুমি বেশি চিন্তা করো না তো। মাষকলায়ে পুকা ধরে না, ইস্পাতের চাকুতে ধার মরে না।—বেশি চিন্তা করলে শরীল খারাপ হবে শুধু। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে, ইবারে হাসপাতালের বড় ডাক্তার, সা' ডাক্তার না কে ঘ্যানে, তার কাচে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার মানিক আবার কোল আলা কোরে আসবে গো—আবার আসবে।

—না রে সতী, না। ইস্পাতটুকুন ছেঁইটে দিয়েচে ডাক্তার, নোহাটা পড়ে আচে। হাজার রেত ঘষলেও লোহার ধার থাকেনি, পল্‌কাগাছ কুপালেও হাঁসুয়ার বুক বুঁকড়া হয়! ডাক্তারবাবু ইস্পাতটুকুনই চুরি করেচে, আমার শরীলে অ্যাখুন শুধু নোহা পড়ে আচে। চাইতে গেলে মনে লাগে, চেরকালের মতুন হেরিয়ে ফেলেচে ইস্পাতট্রকুন! ডাক্তাররা তো আর কামার না—শরীল হতে ইস্পাত খসিয়ে দিতে পারে শুধু, জুড়ার কাজটুকুন অ্যাখুন ভগবানের হাতে।

মা-বাপের মন টানলে কী হবে? ছেলে ফিরে আসে না! মৃত মানুষ কোনদিনই ফিরে আসে না। তবু সাপে কাটা শব কলার মাড়ে (ভেলা) ভাসিয়ে দেয় প্রথামত। মানুষ ভাবে—জলে ভাসতে ভাসতে বিষ যাবে কেটে, তারপর বেঁচেও উঠতে পারে একসময়—এরকম আশা। পরাণ মৃত ছেলেকে ভাসিয়ে দিয়েছে কলার মাড়ে, ভৈরব নদের বুকে। জল স্পর্শে খবর পৌঁছে গেছে উত্তরে জলঙ্গী, দক্ষিণে চুর্ণি হয়ে ভাগিরথী-পদ্মা নদীতে। ভৈরব জলঙ্গি-চুর্ণি-ভাগিরথী-পদ্মা; সব নদীর জল-তরঙ্গ যেন বলে গেল, মৃত্যুই মানুষের পরিণতি, অন্তিম অবস্থা!

তবু ছেলের স্মৃতি ভুলতে পারে না পরাণ। তার খেলার হাড়-বাক্সের ডাংগুলি তুলে রেখেছে সে বারান্দার চালের বাতায়। ঘাপু খেলার টিপিগুলো (ভাঁটা) সযত্নে রেখে দিয়েছে। যখন-তখন তোরঙ্গ খুলে টিপিগুলো দেখে সে—ওগুলোর ভিতরে সে যেন খুঁজে পায় মৃত ছেলের স্মৃতি! ছেলেটার জামা-প্যাণ্টগুলো রেখে দিয়েছে সতী। যখন একলা ঘরে থাকে, ওগুলোর দিকে চেয়ে দু'টো দিঘল চোখে জলের ধারা নামে ক্রমাগত।

বর্ষার জলো হাওয়ায় শীত শীত গন্ধ। রসবতী ভূমির আনাচে-কানাচে জলের ধারা। শিরা-উপশিরার মত গর্তগুলো জলপূর্ণ হয়। কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষীর হা-বাসাড়ে অবস্থা। সাপ, পিঁপড়ে, আরও কত কীট পতঙ্গ

গৃহস্থের ঘরে পরবাসী হয়ে সহবাস করে। সহবাস করলে কী হবে? অন্যের ঘর তো বটে! সাপ পিঁপড়ের ভীত চলাফেরা, নড়াচড়া। ভয়ার্ত দৃষ্টিভ্রমে পিঁপড়ের মরণ কামড়, সাপের বিষদাঁত ফোটান এ সময়ের আকছার ঘটনা।

ছাপরায় বৃষ্টির তালকানা ধ্বনি ছাপিয়ে ছেলেটা কঁকিয়ে ওঠে, ওঁ-আঁ-আঁ! ওরে বাপ্‌রে, মা'রে, খেয়ে ফেলাল রে!

পরাণ কামার ধড়ফড়িয়ে উঠে তক্তাপোষের উপর বসে ছেলের গায়ে হাত দেয়, ও রকম করচিস্‌ কেনে বাপ, ডর লেগেচে না কি? স্বপন দেখেচিস্‌? ভয়ার্ত গলায় ছেলে চ্যাঁচায়, জ্বলে গেল, পুড়ে গেল, আমার পা টাতে কিসে কামড় দিল বাপ!

উৎকণ্ঠিত হয়ে শুধায় পরাণ, কই! কই? দেখি—দেখি!

সদ্য কামড় দেওয়া সাপের দাঁত বসান ডান পা'টা দেখায় ছেলে। ডাকাবুকা ছেলেটা যেন সিজান লাউডগার মত নেতিয়ে গেল! আল কেউটে সাপটা টাটি দরজার নিচ দিয়ে সটকে যাওয়ার মুখে লেজের দিকটা লক্ষ্য পড়ল পরাণের। গাঁয়ের লোক, সাপ চিনতে ভুল করেনি সে। ঝাঁপ খুলে দেখতে দেখতে সাপটা ততক্ষণে পগার পার। ছেলের মৃত্যু হয়েছিল রাস্তায়, হাসপাতালে পেঁছুতে পারেনি পরাণ, গ্রাম থেকে গঞ্জের হাসপাতাল ছ'মাইল দূরে।

মানুষের মৃত্যু হয়, সে দুঃখ নিয়ে ঘরে বসে পেটে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকলে জীবন্ত মানুষের চলে না। চলেনা বলে, পরাণকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কামারশালে যেতে হয়। তাও শুধু কামারশালার কাজ করলেই আজকাল আর পেট চলে না। এখন মেসিনের যুগ, সবকিছু মেসিনে তৈরি হচ্ছে। হাতে তৈরি জিনিসের ওপর মানুষের আকর্ষণ কম। হার্ডওয়ার দোকানে গেলে সবকিছু রেডিমেড্‌, সবই সুন্দর! একমাত্র ফাল পোড়ানোর ব্যাপারে কামারের এখনও একছত্র অধিকার। বাবুরা ট্রাক্টার দিয়ে জমি চাষ করছেন, ফাল পোড়ানর কাজও লাটে উঠতে চলেছে। তাছাড়া, শ্যালো মেসিনের টাকার গরব মেশানো জলে এখন হাল চাষের বড় সুবিধা। নরম মাটির বুকে হড়্‌হড়্‌ ক'রে ফাল চলে। ফালের ক্ষয় হয় কম, তীক্ষ্নতা বজায় থাকে অনেকদিন। এখন কামারের কাজকামে মন্দার বাজার। তবু নিহাই, হাপর, হাতুড়ি, রেত, সাঁড়াশি সযত্নে রাখে সে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এ সবকিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফি বছর। সেদিন কাজকাম বন্ধ থাকে। পরাণ বলে, বাপ-ঠাকুরদার আমল হতে বিশ্বকর্মার পুজা হচ্চে, টুকুন না করলে ওনাদের আত্মা শান্তি পাবে ক্যামনে!

বাপ যশো কামারের যশ ছিল গ্রামঘরে। পরাণ যখন ছোট, বাপ কাজ

শেখাত—কেমন ক'রে আস্ত একটা লোহাপিণ্ড থেকে কাঁচি (কাস্তে), হাঁসুয়া, দা বানাতে হয়। বাপ হাতুড়ির ঘা মারত, ছেলে সাঁড়াশি দিয়ে শক্ত ক'রে ধরত লোহাপিণ্ড। কখনও ছেনি দিয়ে সাদা-গরম লোহার ওপর হাতুড়ির ঘা মারত বাপ, ছোট ছেলেটা শক্ত ক'রে নিহায়ের ওপর চেপে ধরত সাঁড়াশি দিয়ে।

বাপ বলত, এখানে ঘা মারতে মারতে কাঁচি।···এখানে দু'চার ঘা মেরে, উল্‌টা তরফে ঘা দিলে দা।

পরাণের মাথায় কিছুতেই ঢুকত না বাপের কারিকুরি। তাই সে চেয়ে থাকত অন্যমনস্কভাবে। কাজে গাফিলতি। তার মন চলে যেত খাবড়া খেলার দিকে। সিগারেট প্যাকেটের ছবি অলা দু'টো তল এক'শ—দু'শ—এক হাজার—দু'হাজার।···বড় মানুষের টাকার মত দামী সিগারেট প্যাকেটের আয়তাকার তলগুলো। চারমিনার এক'শ, নাম্বার টেন দু'শ, কাঁইচি এক হাজার, ফিল্টার উইলস্‌ দু'হাজার। বাবুদের সিগারেট ফুরালে প্যাকেটের আবর্জনা ফেলে দিত জানলা দিয়ে। এ রকম কুড়নো প্যাকেট থেকে জমা হত কত হাজার হাজার মূল্যের সিগারেট প্যাকেট! অই ছবিঅলা সিগারেট—প্যাকেটের আয়তাকার তাসগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কতায় একদিন সাঁড়াশি ফসকে কপালের উপর ছুটে গেছিল লাল লোহাপিণ্ডটা। চার ইঞ্চি পরিমাণ পোড়া দাগটা বরাবরের জন্য চিহ্ন হয়ে রইল কপালে!

তার যেন সত্যিই পোড়াকপাল! বাপের ছিল কাশ ব্যামো। বর্ষা—শীত হাঁপানিতে কষ্ট পেত। বুকের ভিতরটা হাসফাস করত। টেনে টেনে শ্বাস নিত সে। হাঁপানী রোগীর নাকি সহজে মৃত্যু হয় না—কষ্ট করে মরে। কিন্তু, পরাণের কপাল! বাপ মরল, তখনও সে কিশোর। তার তখন সাঁতার না জানা মানুষের জলে পড়ার অবস্থা! বাপ চলে গেল, পড়ে থাকল তার সংসার।

গরিবের এ সংসারে সুখ যেন ছানতার ওপর সর্ষের তেল! বাপ লোহা পিটিয়ে পাঁচ বিঘার দাগ করে গিয়েছিল। উর্বর জমিন। আজ ওই পাঁচ বিঘা জমি নিজের নামে থেকেও সে ভূমিহীন। জমি কালিপদ বিশ্বাসের কাছে বাঁধা দিয়েছে দু'হাজার টাকায়, সেও পাঁচবছর হয়ে গেল। কালিপদ বিশ্বাস অঞ্চল প্রধান, মাতব্বর লোক। প্রধানবাবু জনসেবার সঙ্গে বন্ধকী ব্যবসা ফেঁদেছেন বুক চিতিয়ে। ওটাও কী জনসেবা? গাঁয়ের মানুষগুলো ভাবতে পারে না অত কথা। তাই বিনে পয়সায় প্রধানবাবুর হাঁসুয়া, দা, নিড়েন, ফাল পোড়ান তো আছেই; তার সাথে প্রধান গিন্নির হাতা, বেড়ি, সাঁড়াশি সারানোটাও দু'হাজার টাকার বদলে বেগার খাটা।—ওটা তো ফাউ!

তাড়া খাওয়া খরার (খরগোশ) দৌড়ের মত বেলা বাড়ে, কামারশালার কাজ ছেড়ে পরাণকে ছুটতে হয় গঞ্জে, করিমপুরে। সেখানে এখন সে রাজমিস্ত্রীর জোগালের কাজ করে। এ কাজে এখন বসে থাকা নেই, দিন গেলেই নগদ কড়কড়ে নোট। নগদ টাকা মানেই চাঁদি! নগদ টাকা হাতে পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে অশথতলায় পা ছড়িয়ে বসে পরাণ ভাবে, টাকার নাম ময়নার ছা, মিছার করে সাচার রা। টাকা থাকলে মেড়াকান্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত। টাকার বলে দুনিয়া চলে।...গঞ্জের বাবুরা বড় বড় পাকাবাড়ি তুলছেন। ইট-ভাটায় মাটি পুড়ে হচ্ছে লাল ইট। মাটি পুড়লে ছাই হয় না—দাম বাড়ে। মাটি মুঠোলে সোনামুঠো হয়! পরাণ তাঁর বন্ধুদের বলে, মাটি হচ্চে গরিব মানুষ পারা, ইটের বাড়ি হচ্চে কী বড়নোক। বন্ধুরা অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। আরও ব্যাখ্যা করে সে বলে, মাটি পুড়িয়ে য্যামুন ইট তোয়ের হয়, এক'শ গরিব মাড়িয়ে তবেই না বড়লোক হয়া। বড় বড় বাড়িগুলান য্যামুন ঠাট্ দেখিয়ে মাটির বুকে দাঁড়িয়ে থাকে, পুড়া মাটির গাঁথনি নি', ত্যামন। গরিব মানুষের কাজ কামের উপুর দাঁড়িয়ে আচে বড়লোকরা—

দিনের আলো ঠাণ্ডা লোহার মত ম্লান হয়, গাঁয়ের রাস্তায় পা বাড়ায় পরান। গঞ্জের পাকা রাস্তা থেকে গাঁ গুলোর বুক চিরে চলে গেছে রাস্তাটা, যেমন নদী থেকে শাখানদী বেরোয়। শাখানদী রাস্তাগুলো খালের মত শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে চলে গেছে বাড়ির দুয়ারে, ঢোলকলমী রাংচিতা বেড়ার গায়ে। বাচ্চাদের খেলনা সানাইবাঁশি পারা ঢোলকলমীফুল, তামাটে রঙের যে রাংচিতা পাতা খসে পড়বে ক'দিন বাদে—এ সময়ে ওগুলোই বাড়ির নিশানা। রাস্তার দু'ধারে মেয়েদের কানপাশার মত ফুটে থাকা সজনে ফুল দিনশেষের ম্লান আলোতে আরো সাদা দেখায়! সাদা ফুলের সাজে সজনে গাছের যেন সুন্দরী মেয়ের দেমাক! রাস্তার দু'ধারে সদ্য যৌবনে পা রাখা সর্ষেক্ষেতে শেষবেলায় মৌমাছিরা গুনগুন ক'রে খবর নিয়ে যায়...হলুদ রঙা ক'টা ফুল ফুটল? মধু পাওয়া যাবে কিনা? মৃদু হাওয়ায় সর্ষে গাছগুলো ভবিষ্যতের গরব দেখিয়ে পরস্পর এ ওর গায়ে ঢলাঢলি করে, ইশারায় মৌমাছিদের যেন বলছে—তোরা এখন যা, আমর এখনও অক্ষত যোনি! পথ চলতে চলতে এদিক ওদিক তাকানোর সময়ে সর্ষেক্ষেতের দিকে নজর পড়তে পরান ভাবে, ক'দিন বাদেই সর্ষেগাছগুলান সিনিমার নায়িকার মতুন হলুদ রঙের উড়না মাথায় দেবে—তারপর শীতের শুরুতে তো হলুদ চাদরের বিছানা পেতে শুতে ডাকবে মৌমাছি প্রজাপতিদের।

সাইকেলের ক্রিং ক্রিং ঘন্টার শব্দে ভাবনার জাল ছিঁড়ে সম্বিৎ ফিরে পেল সে।

—অ্যাই পরান ! তোর যে দেখা মেলা ভার, ডুমুরের ফুল হলি নাকি ? কথাগুলো বলতে বলতে সাইকেলের ব্রেক কষে কানা বগার মত এক পায়ে দাঁড়ালেন প্রধানবাবু।

—আজ্ঞে, তা প্যাটের জন্যি ছুটেতে হচ্চে বাহারপানে। টেইম হচ্চে নি বাবু।

প্রধানবাবু চোখ মটকে বলে, বড় টাইমবাজ হয়েছিস দেখছি ! খাস জমির পাট্টা হাতে পাবার সাথে সাথেই পাখা গজেছে—কথাটা জানিস তো, পিপিলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে ! কেষ্ট কিন্তু ভোটের সময় আমার হয়ে খেটেছিল খুব—

গঞ্জে কাজ করে পরানও এখন সেয়ানা ; প্রধানবাবুর কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বোঝে সে। বলে, আজ্ঞে বাবু, আপুনি আমার মা-বাপ, তা যা বলেচেন—

—বেশি ন্যাকামী করিসনি বলছি, টাকা কবে শোধ দিবি বল—না হলে মাঘ মাসেই জমিটা কিন্তু আমার নামে রেজিস্ট্রি ক'রে দিবি।

—না-বাবু না, টাকা আমি শোদ দিব। আর ক'টা দিন যেতে দ্যান।

—রাখতো ওসব বাজে কথা, কাজের কথা শোন—আমার বাড়িতে কাজের ঝি নেই, তোর বো'টাকে আমার বাড়িতে কাজে লাগানা ?

—সেটা হবেনি বাবু, আমাদের ঘরের বো' কখুনো ঝি গিরি করেনি।

—ওরে গর্দভ ! ঝি গিরি করতে বলছি নাকি ?—হাঁদারাম কোথাকার ! আমি বলছি কী, ছেলেপুলে না থাকলে ঘরে বসে থেকে থেকে একলা মেয়েমানুষের মাথায় কত কুচিন্তা আসে, কত বিপদ ! গুড়ের হাঁড়ি থাকলেই পিঁপড়ে আসে বুঝলি কিছু ?

—আজ্ঞে !

—আজ্ঞে ভাজ্ঞে না, তোর বউয়ের জন্যে আমার দুঃখের শেষ নেই ! তুই তো একেবারেই খোজা হয়ে গেলি—তা ছেলেপুলের জন্যে তো মানুষটার বুক ফাটবেই। তাই বলছিলাম, যদি কাজের মধ্যে ডুবে থাকে, ভুলে থাকবে শোকের কথাগুলো। নাহলে কবে রাতে এসে দেখবি বউটা গায়ে কেরাসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে। তখন কিন্তু তোর বিপদের ওপর বিপদ হবে বলে দিচ্ছি—খাস জমিটা কেষ্টার নামে বন্দোবস্ত ক'রে দিব।

—আমার বো' ঝি খাটতে পারবেনি বাবু, ছেলেডা চলে যাবার পর হতেই অসুস্থ ? পাগলপারা হয়েচে য্যানে !

—তবে আর কি ? সে জন্যেই তো বলছিলাম—খোজা বরের মাগ, কাজের ভিতর রাখ।

ওই এককথায় কাৎ হয় পরাণ। প্রধানবাবুর বলা কথাগুলো ভাবতে ভাবতে

সারারাত ঘুমোতে পারেনি। ছটফট করেছে। তার ওপর বাতের যন্ত্রণা; সারাবছরই সে বাতব্যাধিতে ভোগে। গাঁদাল পাতার রসসহ কাঁচা রসুন জলের সঙ্গে নিশিন্দা পাতার গুঁড়ো খায় বছর ভর। রসুন ভাজা সর্ষের তেল গা হাত পায়ে মালিশ ক'রে দেয় সতী, তবু যন্ত্রণা কমেনি। আসলে ব্যাধি সারলেও, আধি সারে না সহজে! রসুন ভাজা সর্ষের তেল মালিশ করলে মনোরোগ কি কমে?

মনের রোগ মেটাতে কাক-ভোরে উঠে সাত সকালে গঞ্জের সরকারি হাসপাতালে ছোটে সে। গায়ে আধছেঁড়া হাতঅলা হলদেটে গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি, কাঁধে উড়ানির মত ময়লা তেলচিটে ডোরাকাটা লাল গামছা। গাঁ থেকে হাসপাতাল ছ'মাইল পথ· সেখানে পেঁছুতে পেঁছুতে হেমন্তের রোদে স্নান করছে ওখানকার ঘর বাড়ি, রাস্তা ঘাট, গাছপালা। টেলিফোনের তারে তারে বোনা মাকড়সার জালে বাঁধাপড়া শিশিরবিন্দুতে রামধনুর সাতরঙ খেলে বেড়ায়। সব রঙগুলোই আজ পরানের কাছে ভীষণভাবে অর্থহীন। চোখের সামনে রঙ খেলার ঘুরপাকে সবকিছু সাদা দেখায়। হাসপাতালের দোরে পেঁছে লুঙ্গির ট্যাঁকে হাত দেয় সে, বিড়ি দেশলাই টাকাগুলো ঠিকঠাকই আছে। আশ্বস্ত হয় সে। হাসপাতালের লম্বা লাইন দেখে লাইনে দাঁড়ান একজনকে শুধায়, ইটা কিসের জন্যি বটে? লোকটা উত্তর দেয়, এটা সা' ডাক্তারকে দেখানোর জন্য লাইন, আউটডোর।

লাইনের শেষে দাঁড়ানো একজন বুড়ো লোক কাঁপা গলায় বলে, অ্যাই যে এখেনে, আমার পিছনে এসে লাইনে দাঁড়াও বাবা।

বুড়োর পিছনে গিয়ে লাইনে দাঁড়ায় সে। বেলা বাড়ে।···লাইন লম্বা হয়। কিন্তু তখনো ডাক্তারবাবুর পাত্তা নেই। সকালের দিকে উনি নাকি চেম্বারে রোগ। দেখেন, তারপর হাসপাতালে আসেন!

ডাক্তারবাবু এসে গম্ভীর মুখ ক'রে একে একে রোগী দেখেন, প্রশ্ন করেন, কম্পাউন্ডারের হাতে ওষুধের প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। সবই যেন বাঁধা গত, বাঁধা ওষুধ! পরাণের লাইন আসে। ডাক্তারবাবু গম্ভীর স্বরে শুধায়, তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে?

—আজ্ঞে! গোপন কতা, টুকুন উপাশটাতে গেলে—

—না না, তাড়াতাড়ি বল। আমার অত সময় নেই! আর, অত গোপন কথা বলতে হ'লে আমার চেম্বারে আসতে হবে।—বুঝলে?

—তা তো বুঝিচ বাবু, কিন্তুক্ অত টাকা যে নেই!

—টাকা নেই তো আমার কাছে অত গোপন কথা কিসের, অ্যাঁ? আমার সময় নষ্ট না ক'রে তাড়াতাড়ি বলে ফেল অসুখটা কী।

এদিক ওদিক লাজুক চেয়ে চোখ নামিয়ে সে বলে, আজ্ঞে ই, হাসপাতাল হতে রগ কাটা হয়েছিলাম। তা বছর দশেক হবে। এখন আমার ছানাপুনা হচ্চেনি।

—হা হা হা! ভ্যাসেক্‌ট্যামি করেছ, আবার ছেলে হবে কি করে?

ধরা গলায় পরান বলে, আমার এক মাত্তর সন্তান সাপে কেইটে মরে গেছে বাবু···আমাকে বাঁচান···। কথাটা বলতে বলতে হাঁটুমুড়ে বসে ডাক্তারের পা দুটো জড়িয়ে ধরে সে।

—দ্যাখো, ভ্যাসেক্‌ট্যামিক কেস, কারোর কিছু করার নেই। বড় জোর কেষ্টনগর সদর হাসপাতালে রেফার করতে পারি।

—কেষ্টনগর সদর হাসপাতাল! সে তো অনেক খরচা—এখেনেই য্যাখুন কেটেচেন, বাবু গো! জুড়ে দ্যান না দয়া করে।

—তুমি তো বড় নাছোড় দেখছি! জোড়া বললেই জোড়া, যত্তসব চাষাভুষো নিয়ে কারবার হয়েছে এখানে! আরে বাবা, তোমাকে বোঝাব কীভাবে—

—ভ্যাসক্‌ট্যামির কেস যে জোড়া যায় না।

ডাক্তারের শেষ কথাটা শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে পরাণ।

দিন যায়।···নপুংসক পরাণ যেন পাগলের মত হয়ে গেছে। কাজ পাগল। সমস্ত দিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চায় সে। কামারশালার নিহাই, হাতুড়ি, হাপর, রেত, সাঁড়াশি; সব জিনিসগুলোকেই গভীর মমতায় নেড়েচড়ে দেখে সে! বারবার। ওই জিনিসগুলো স্পর্শ করেই যেন ওগুলোর মধ্যেই হারানো ছেলেকে খুঁজে পায় সে। ছেলেকে স্পর্শ করার সুখ অনুভব করে মনে মনে। আজ জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে পুরো দিনটা সাবাড় হয়ে সাঁঝ হ'ল। এখন যেন মনের মধ্যে ছেলেকে স্পর্শ করার অনুভূতি বাঁধ ভাঙা জলের প্লাবনের মত। পাগলের নত চিৎকার করে এই অনুভূতি সে সতীর কানে পেঁাছে দিতে চাইল, সতী ঈ ঈ! সতী ঈ রে এ এ···। আমাদের মাণিক ফিরে এয়েচে, শিগ্‌গির দেখবি আয়!

ঠিক সেই মুহূর্তে; বাড়ির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে, সুরুৎ করে বেড়া টপকিয়ে, একটা মানুষের ছায়ামূর্তি পালিয়ে যায়—চুরি করে মাছ খাওয়া বেড়ালের মত। শুকনো পাতার খস্‌খস্‌ আওয়াজে সচকিত হয়ে পরাণ দেখে—অন্ধকারের প্রাচীর ভেদ করে প্রধানবাবুর ছায়ামূর্তিটা তড়িৎ বেগে সরে যাচ্ছে। আর সতী গর্ভধারিণীর মত মুখ করে চেয়ে আছে তার দিকে। পরাণের চোখে সতী তখন ফুল আসা সর্ষে গাছের মতন।

ভাগ্যবতীর ভোটছাপ

পাতা খসানো কাঠ-করবীগাছের মত আরও একটা ভোট এল !

ভোট এলে গ্রাম, শহরের হাওয়ায় ওড়ে টাকা। টাকা তো নয়, যেন পাতা ঝরা গাছের খসখসে শুকনো পাতা। জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা টাকাগুলো ঝরে পড়ে আরও একবার তাদেরই ঘাড় ভাঙতে। গ্রামের মানুষ হাপুস নয়নে দেখে এসব। তাই, ভোট এলে আর একটা উৎসব আসে গ্রামে। তখন মানুষের কোনো দিকে নজর বোলানোর অবকাশ থাকে না। উৎসব মুখর দিনগুলোতে হা-জিনিসে ঝোলা পূর্ণ হয় প্রতিশ্রুতিতে। কখনো-সখনো নগদ টাকা কিংবা লোভনীয় জিনিসপত্র থাকে না তা নয়। তবে, প্রতিশ্রুতি যেন উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা ; বড়লোকী রাজনীতির ভুলোয় ধরা দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষগুলোর নিশানা। ঠিকানা।

ফাতু কিন্তু মোটেই পাগলী নয়, তবু লোকে তাকে ডাকে 'ফাতু পাগলী।' সে যে ধরণের জীবনযাপনে অভ্যস্ত তা আর পাঁচটা অশিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে বিসদৃশ। বিশদৃশ হ'লে কী হবে ! শিক্ষিতদের চোখে এরা সবাই-ই বুদ্ধিনাশা পাগল। শিক্ষিত মানুষের ছিন্নমূল গাছের ছায়ায় এদের বুদ্ধি যেন ইটচাপা ঘাস। বুদ্ধিমান মানুষগুলো ভোটের আগে ইট তুলে ঘাসবুদ্ধির মানুষগুলোকে জাগ্রত করে, আবার ভোট ফুরোলে ইট চাপা দেয় পরবর্তী ভোট পর্যন্ত। অর্থাৎ, ভোট উৎসবের দিনগুলো ছাড়া বাকি দিনগুলোতে সমাহিত বুদ্ধির সম্বল। ফাতুর বুদ্ধি অবশ্য লোকের চোখে সমাহিত হয়ে আছে চিরকালের জন্যে। তাই এ গ্রামে বোকা লোক বোঝাতে 'ফাতু পাগলীর বুদ্ধি' কথাটা প্রবাদের মত ছড়ানো। ফাতুও অবশ্য এ-কথা শুনলে দুঃখ পায় ; দুঃখ তো বোকা-বুদ্ধিমান মানে না, দঃখ হচ্ছে জঙ্গমের আত্মপ্রকাশ।

এই তো মানুষটি, তার ওপর ছেলেতে খেদানো বিধবা সে। ছেলে চাকরি করে পুলিশে। বউ-ছেলে নিয়ে বাস করছে সদরে। ছেলের বাসাবাড়িতে ফাতুও ছিল কিছুদিন। তখন গ্রামের বাড়ি বেচে দিয়েছিল ছেলে। নিঃসঙ্গ নির্বাসিনী ভৈরবীর মত একটা ছাতিমগাছ মাঝ উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল নীরব সাক্ষী হয়ে। ছেলে বলেছিল, থাকার মানুষগুলোই যখন এখানে, তখন শুধু-মুদু বাড়ি রেখে কী আর হবে ! ফাতুর ভাল লাগেনি বাড়ি বিক্রি করার ব্যাপারটা। তাই সে বলেছিল, পিতিপুরুষের বাড়ি বেচে ভিটিতে ঘুঘু চরালি মুনু ! ছেলে বড় হ'লে সে-ছেলেই হয় বিধবা মায়ের অভিভাবক। তাই মুনু কটাক্ষ করে উত্তর দিয়েছিল, বাড়ি বেচেছি, তবু ঘুঘু চরবে, ও—

ভিক্ষার ঝোলাতে—ওই বাড়ীটা ভিখারীর হাতে তলফুটো ঝুড়ি বইত নয়। এ কথাগুলো বৈঁচিকাঁটার মত বিঁধেছিল ফাতুর বুকে। তবু, অন্ধ স্নেহ-মমতা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল তাকে। বউ-এর কাঁটা বেঁধানো কথা নিত্যদিনের ঘটনা ছিল। তবু, ছেলের কাছে থাকার মোহে বলেছে সে, মন আর আমিই জানি আমার কতা লোকে জানবে কি। কথার উত্তরে বউ-এর মুখের চোটে আকাশ ফাটে, মাকড়সার মতন চুষে খেয়ে ফেল্‌লো আমাকে—মিন্‌সের আবার মা-মা বাতিক দেখলে গা-পিত্তি জ্বলে যায়; কথায় বলে না, বাপ গুণে পো। কথাটা খ্যাচ্‌ ক'রে লাগল ফাতুর মনে। বিধবারা কখনো স্বামী নিন্দা সহ্য করতে পারে না, তাই ধরাগলায় বলেছে, দ্যাখ্‌ বউ, আমার ছামুতে কখ্‌নো বাপ তুলে কতা কোস্‌নি—এ বলে দিচ্চি কিন্তুক্‌, হ্যাঁ। দু'জনের কথপো-কথনে এতক্ষণ বিজলী ঝল্‌কাচ্ছিল, এবারে বউ বাজপড়ার মত হামলে পড়ল শাশুড়ীর ঘাড়ে। বউ এর চোখে আগুনের দপদপানি। তারপর কিল, চাপড়, চুল ধরে হেঁচড়া হেঁচড়ি; অপমানের কোন পন্থাই বাদ পড়েনি সেদিন।

এরকম অপমান সহ্য হয়নি তার, তাই বছর দুই হলো শ্বশুর ভিটার ঘুঘু তাড়িয়ে ছাতিম গাছটার উত্তর ধার ঘেঁষে বেঁধেছে একটা কুঁড়েঘর। ছেলে তো দু'বছর আগেই এক সাথে দু'হাজার টাকা দিয়েই খালাস। বলেছে, পেটে ধরেছো শুধু, মানুষ তো করোনি। এখন যা যা করছি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। দু'হাতে ঢাকা চোখ থেকে মুক্তো ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল ফাতুর গাল বেয়ে।

পাতাঝরা আমড়া গাছের মত নিজেকে ইদানীং মনে হয় ফাতুর। ছেলের অমঙ্গলের আশঙ্কায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় করে তার। তাই নীরবে চেয়ে থাকে মাটির দিকে। মাকে নীরব থাকতে দেখে, সম্মতি আছে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনু বলেছে, আঃ, বাঁচলাম! যাও, তোমার সব ঋণ আমি শোধ করে দিলাম।

কতদিন হ'লো আয়নাতে নিজের মুখ দেখেনি ফাতু। ঘোষালগিন্নি কাচফাটা, ফ্রেমখোলা একটা আয়না ফেলে দিয়েছিল সারগর্তে। সেটা কুড়িয়ে এনে মাথা আঁচড়ানোর কাজ চলেছে বেশ কিছুদিন। এখন আর আয়না দেখে মাথা আঁচড়ায় না সে, আন্দাজে চিরুনি চালায় পাটক্ষেতে নাংলি দেবার মত। আবার এ সময়ে যখন তখন ভোটবাবুরা আসছে; তাই ভাবল সে, হাতে হলুদ না লাগালে সে আবার রাঁধুনী কিসের? চুলের যা ছিরি, জট পেইকে গিচে একেরে। ইবারেউ ভোট যখুন দিতেই হবে, তখন বাবুদের ছামুতে এট্টু সেজে গুজে বেরানো যাক্‌। ভাবতে ভাবতে ভাঙা আয়নাটি নিয়ে ছাতিম গাছটার আধছায়ায় বসল পা ছড়িয়ে। প্রলম্বিত ছায়া পড়েছে ছাতিমগাছের পুব

জমিনে। জটাধারী ভৈরবী ছাতিম গাছটাও যেন নিজের গতর দেখতে উঁকি ঝুঁকি মারছে মাটির আয়নাতে! সে আয়নার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল, আয়নার ভেতরে কেনে ছাতিমগুঁড়ি দেখা যায়, তবে কী আমার চেহারাটা…। পারাচটা আয়নাটা ছুঁড়ে মারল ছাতিম গুঁড়িতে! ঝন্-ঝনাৎ শব্দে কাচ ভেঙে হ'ল খানচুর। মাথা উঁচু করে হাপুস চোখে শুধু ছাতিম গাছটাকে দেখতে থাকল সে। এখন শীত শেষ বেলায় ছাতিম গাছের দেমাক বড়ই বেশী। জটাধারী ভৈরবীই বটে; তবে ঠিক যেন মেকী ভৈরবী! তা না হলে ভৈরবী সন্ন্যাসিনী হয়ে অত দেমাক কেন? গরিব গুবরো মানুষের কুঁড়েঘরের উঠোন জমিনে আম কাঁঠাল পেয়ারা লাগানোর জায়গা থাকে না। তা ছাড়া, ওগুলো খুবই সোহাগী গাছ! আমড়া, জিওলা-কচা, রাংচিতা বড় উদাসীন গাছ। উঠোন বেড়ায় অনাদরে বাড়তে থাকে গরিব সন্তানের মত। এ সময়ে এরা তো একেবারে নাগা সন্ন্যাসী; পাতা ঝরিয়ে উদোম গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে আকাশ পানে মুখ ক'রে। শুধু ব্যতিক্রম মাঝ উঠোনে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছাতিম গাছটা আর বেড়ার ধারে অনাদরে বেড়ে ওঠা কুল, জামালকোটা গাছগুলো! আশে পাশের পাহারাদার রিক্ত-নিঃস্ব গাছগুলোর কাছে ছাতিমগাছটা যেন আদা বনে শেয়াল রাজার মতন! সেইজন্য গাছটাকে ঘন সবুজতর দেখায়।

নীল আকাশ সাঁতরানো হাতিশুঁড়ের মতন মেঘ ভেসে ভেসে যায় উদাসী বাউলের ভঙ্গিমায়; দুষ্টু মেয়ের লুকোচুরি খেলা, বৃষ্টি হয় এ মেঘে। উদাসিনী বৈষ্ণবী দৃষ্টিতে আকাশের বুকে মেঘের খেলা দেখতে দেখতে ফাতু ভাবে, এ কী ম্যাঘের শীত; না, মাঘের শীত!

—দিদি গো! ও ফাতু দি। নির্মলবাবু বিনয় মেলানো স্বরে বলল কথাগুলো। অমন ক'রে দিদি ডাক অনেকদিন হল শোনেনি ফাতু। সেই গত ভোটের সময়গুলোতে যাওবা শুনেছিল,—এখন তা বিস্মৃতির অন্তরালে। অবাক হয়ে সে তাকাল ছাতিম গাছটার লম্বা ছায়া বরাবর; পঞ্চায়েত প্রধান দীনদয়ালবাবুর দড় ছেলে নির্মলবাবুকে দেখল পুব দিকের রাস্তা ধরে হেঁটে আসতে। গবরা গাছের মঞ্জরীর চেয়ে সুন্দর শুঁড়ি রাস্তাটা পুব-পশ্চিমে গিয়ে মিশে গেছে উত্তর দক্ষিণের চ্যাথ্রা, কাঁচা বড় রাস্তার সাথে। দিদি—ডাক শুনে আহ্লাদে গলে জল হয়ে গেল ফাতু। ধুসর রঙের ছেঁড়া, ছাতলাপড়া খেজুরপাটি ঘর থেকে নিয়ে এসে ছাতিম তলায় দিল পেতে। বলল, বসো ভাই, গরিবের ঘরে কুথায় আর বসতে দি, ইখেনেই বসো। ব'লে, পাশেই মাটিতে নিজে বসে পড়ল হাঁটুমুড়ে। নির্মলবাবু আরও বিনয় গদগদ হয়ে, কাঁকুড়বীচি দাঁত বের ক'রে, কমলাকোয়া হেসে খেজুর পাটিতে বসল। কোন রকম ভণিতা

না ক'রে ভোট জড়ানো সোজা কথায় কুশল শুধাল সে, ভোট তো এসে গেল দিদি! তা, ভোটকালে কেমন চলছে দিনক্ষণ? আছো কেমন?

—সব দিনগুলানই ত একাদশীর দিনপারা।

—অতো ভেঙে পড়লে চলবে কেন দিদি? আমরা তো আছি তোমার পিছনে। তা, তুমার কাচে ঠেকায় পড়ে এসেছিলাম, দু'টা কথা আছে।

ফাতু উতলা গলায় শুধাল, কী কতা?

—ভোটের কথা। বলি, ভোট তো এসেই গেল—আর তো মাত্র দশটা দিন বাকি। তা, তোমার ভোটটা আমাদের দিও কিন্তু। বলে ছবিঅলা চৌরস একটা ইস্তাহার ধরল খুলে, এই হচ্ছে আমাদের চিহ্ন—এই চিহ্নেই ভোট দেবে বুঝলে?

ছবিটা দেখে অবুঝের গলায় ফাতু বলল, তা ভাই, তুমার দল কি জ্যোতিষ-টোতিস করে না কি! তুমার দল বুঝি জ্যোতিষ দল? তা ভোট জিতলে আমার হাত ভাল কোরে দেখে দিবে কিন্তুক্—তখুন তুমার দলবল নি' এসো ভাই, নিমন্তন্ন থাকলো আগাম।

—তোমাকে ভোটের ব্যাপারটা বোঝানো বড় দায় দেখছি। তা, তোমার অত বুঝে কাজ নেই। ওহ্, একটা কথা ভুলো না, আমি কিন্তু বাবার দলের না।

—সে কী! বেটা বাপের দলে থাকবে না, সে আবার কী অলুক্ষুনে কতা রে বাবা!

—বাবাদের দলের ক্যাডার পোষণ নীতি আমার ভাল লাগে না তাই,—আরে দিদি ওসব কথা ছাড়ো তো, আমি যা বললাম তাই কোরবে। ফাতু সম্মতির ঘাড় ঝুঁকালো।

—তা হলে আমি দিদি—, ওই কথাই রইল কিন্তু। একথা ব'লে নির্মলবাবু চলে গেল।

নির্মলবাবু চলে যেতেই খেজুরপাটির ওপর পা ছড়িয়ে গ্যাঁট্সে বসল ফাতু। ভাবনার সুতো ধরে ধরে পেঁছে গেল দীনদয়ালবাবু অব্দি। দীন দয়ালবাবু একটা কানা শুক্কুর!—বড় এক চোখো!

সেবার ভোটের সময় বলেছিল, এবারের ভোটটা আমাদের দিয়ো কিন্তু। ভোটে জিতে প্রধান হলে তোমার যা যা দরকার সব দেব। ভোট গেল। কিন্তু কিছুই পেল না ফাতু। মনের দুঃখে কপাল চাপড়ে ডুকরে উঠল সে।

বুনোপাড়ার মণি সর্দার পুব-পশ্চিমের সরু রাস্তাটায় পা বাড়াল! রাস্তা ধরে আসতে আসতে বলল, ও ফাতু মাসী! কি হলো? অমুন কোরে কপাল চাপড়াচ্চো কেনে? মণি সর্দার কথাটা বলার পরও নির্বাক বসে থাকল

ফাতু। আকুল গলায় জোরে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে এল মণি, ফাতু মাসী-ঈ-ঈ! ও-ফাতু-উ মাসী-ঈ!

ভাবনার সুতোটি ছিঁড়ে গেল আচম্বিতে ; সম্বিৎ ফিরে এল ফাতুর। মণির দিকে চোখ তুলে বলল, সন্দার মামাগো, এখেনটাই বসো। বলে, নিজে একটু তফাতে সরে বসলো ঐ পাটিরই পশ্চিম পাশে। মুখটা থাকল পূর্বদিকে। পশ্চিম দিকে মুখ করে বসা মণির মুখমণ্ডলে তখন অস্তমিত সূর্যের লালাভা রশ্মি পড়েছে। নিকষ কালো মুখের চামড়া সেই লাল রশ্মি শুষে নিতে লাগল পিপাসার্ত পশুর জলপানের মত। সন্দার মামাকে হঠাৎ যেন খুব আপনজন মনে হল ফাতুর। মণি শুরু করলো এইভাবে, এই আস্‌বো আস্‌বো কোরে টেইম হচ্চোনি গো মাসী। ভোটকালে কাজ-কাম খুব বেড়েচে। পার্টির কামে ঘুরচি দিনভর। কখুনো রাতদুকুর হচ্চে ঘর আসতে। তুমার সাথে দেকা করার মোতুন সময় হচ্চে নি গো মাসী।—উসব কতা ছাড়ো, বলো আচো ক্যামুন ?

—মোর আর থাকা! বেটা যার বুকের খেয়ে মুখের ঝাম্‌টা মারে, ই-পিথিমিতে তার থাকা আর না থাকা!

—কেনে ? মোরা তো আচি কেনে মাসী ! ই-বান্দা তো তুমার প্যাটের ছা'য়ের মোতুন ধরতে গেলে।

—তা, তুমার ইবার কুন্‌ দল বাপ ?

—মোরা হচ্চি কা। ম্যাহনতী মানুষের দিকে, তুমার আমার মোতুন গরীব দুখ্‌খী নিয়েই আমাদের দল।

—তা খোল্‌সা কোরে বলোই না কী চাও তুমরা ?

—তুমার এট্টা ভোট চাই মাসী। এই বলে দলের চিহ্ন আঁকা ইস্তাহার বের করল মণি। বলল, ই-হচ্চে কা। মোদের দলের চেহ্ন! ইবারে কিন্তুক ই চেহ্নতেই ছাপ দিবা। ফাতু অবাক গলায় বলে, উ-বাবা! ই-চেহ্ন তো আগেই ছিলো, তুমাদের বুঝি দল পাল্‌টায়নি ?

গর্বের হাসি হেসে মণি সর্দার প্যাটপেটে চোখে তাকায়। ফাতু বুড়ি এ চাহুনির অর্থ বোঝে। তাঁতী কেমন তাঁত বুনেছে, তা তো তাঁতী ছাড়া অতো ভাল আর কেউ জানে না। হাসিটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে ফাতু বুড়ির মুখে। মণি সর্দার চলে যাবার পর সে আবার একা হয়ে যায়।

সন্ধে গড়িয়ে রাত নামে চরাচরে। শেষ রাতে মোরগ বাঁক দেয় দফায় দফায় মান্য দাসের বাড়িতে।

এ পাড়ায় বাড়িগুলোর সীমানা আলাদা করা থাকে পাটকাটি জাফরি বেড়া ঘিরে। ফাতুর বাড়ির গা-লাগা মান্য দাসের বাড়িও পাটকাটির জাফরি বেড়া

দিয়ে ঘেরা। পাটকাটি বেড়ার ওপিঠে শেষবারের মত মোরগ বাঁক দিলে ফাতু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে; বাসি ঘর ঝাঁট দেওয়া হ'লে সে পা বাড়ায় ঘোষাল মশাইয়ের ডোবা পুকুরে। পায়ে হাঁটা পথটার দু'ধারে আস্‌শ্যাওড়া, আকন্দ, ধল-ধুত্‌রো গাছগুলো যেন রাতভর হিমে স্নান করেছে! জল-সিক্ত এলোচুল শুকনো মেয়েদের মত রোদ পোহাচ্ছে ডালপালা এলিয়ে। বিরহ-কাতর প্রোষিতভর্তৃকার স্বামী মিলনে আনন্দিত চোখ ছলছলানো সিক্ততা গাছগুলোর পাতাতে। সদ্য সকালে গুঁড়ো গুঁড়ো রোদ এক রাতের বিরহে চিক্‌চিকানি ভরিয়ে দিচ্ছে পাতায় পাতায়,—অনুরাগের চুমায়! কিছুটা হেঁটে হাঁটু ভেঙ্গে বসে ফাতু বুড়ি আস্‌শ্যাওড়ার ডাল ভাঙল একটা। সেই ডালটার গোঁড়ার দিকটা দাঁতন বানিয়ে, দাঁতে ঘষতে ঘষতে চলল এগিয়ে।

ডোবা পুকুর যাওয়ার রাস্তার একধারে সরকারি বন বিভাগ। আকাশমণি, ইউক্যালিপ্‌টাস, কাঠ-বাবলা, শাল-শিরীষ সমাচ্ছন্ন জঙ্গল। এখন সকাল থেকেই গাছকাটার তাড়াহুড়ো। সামনে ভোট। ভোট মানেই ক্ষমতা দখলের লড়াই। ক্ষমতা যদি ল্যাংমারা অভিমানী প্রেমিকার মত চলে যায়, এই ভয়েই গাছকাটার এত তাড়াহুড়ো। ক্ষমতা হ্যতছাড়া হ'লে বন বিভাগটাও অন্য কারোর হাতে চলে যাবে—তারাও ভোটের আগে এমনিভাবে গাছ কাটবে আবার···। পঞ্চায়েত বাবুরা মুনিশ লাগিয়ে গাছ কাটাচ্ছেন। স্বয়ং দীনদয়ালবাবু আছেন তদারকিতে। দীনদয়ালবাবু মুনিশগুলোকে বললেন, অ্যাই! তোরা গুঁড়িগুলো অতো ছোট ছোট ক'রে কাটছিস্‌ কেন—কাঠের দাম যে কমে যাবে রে বোকারা! ভয়ে ভয়ে একজন হোঁতকা গোছের মুনিশ শুধাল, ক্যামুন কাটবো বাবু?

—অই বড় গুঁড়িগুলোর ভোগে (মাঝে) একটা ভোট দে, তা হলেই হবে,—বুঝলি হাঁদারামরা সব? প্রধানবাবু আদেশের স্বরে বলছিলেন কথাগুলো। স্নান সেরে, ঠিক সেই সময় বাড়ি ফিরছিল ফাতু। মাথায় কলাবউ মার্কা ঘোমটা টানতে গিয়ে গোড়ালি উদোম আটহাতি থান কাপড়ে খড়ো ঘরে ঝাড় টাঙানো শোভা! কাপড় চুঁয়নো জলধারা গভীর মমতায় তার পায়ের পাতা ছুঁয়ে মাটির বুকে আঁকতে থাকে ভিজে পায়ের লক্ষ্মীমন্ত ছাপ।

প্রধানবাবুর গলায় 'ভোট' কথাটা শুনে ফাতুর পায়ের ছাপগুলো প্রথমে কাছাকাছি পড়তে থাকল, মুহূর্ত পরে ছাপপড়া বন্ধ হল—ফাতু উৎকর্ণ চোখে বনের ভিতর দৃষ্টিপাত করল। একটু থেমে; বুঝতে পারলো—এ 'ভোট' সে ভোট নয়।

ঘোষাল বাড়ি থেকে ঝি খেটে বাড়ি ফিরতে দুপুর গড়ায় ফাতুর। ঠা ঠা দুপুরে রোদ মাড়ানো সাইকেল মিছিল উত্তর দক্ষিণের চ্যাথরা রাস্তা ধরে এগিয়ে

আসছে গঞ্জ থেকে। তাদের স্লোগানে সাধারণ মানুষের দাবী সম্বন্ধীয় বীজ মন্ত্র।—অমুক করতে হবে, অমুক দিতে হবে। তাছাড়া নির্দিষ্ট চিহ্নে ভোট দেবার জন্যে আকুল কলরোল প্রার্থনা। রাখাল বালকেরা থামিয়ে দিল গেরুর পাল। ধান ক্ষেতে মুনিশরা বন্ধ করল কাজ। আর মানুষগুলো হলো উৎসুক। পাল থেকে ছুটে যাওয়া গোরু ভয়াতুর শব্দ তুলল, হাম্বা হাম্বা আ-আ···। ছাগলগুলো ডাকতে থাকল, ব্যা অ্যা, ব্যা অ্যা। রাস্তাধারের নেড়ে কুকুর ডাকতে থাকল, ঘেউ ঘেউ উ উ···। ফাতুও দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে দেখতে থাকল মিছিল! মিছিলের সামনেটা যখন গ্রামের অপর প্রান্তে পেঁছাল, তখন লেজের দিকটা ফাঁকা রাস্তাটা ফেলে রেখে চলল এগিয়ে। শুধু রাস্তা ধারের নেড়ে কুকুরগুলো ফাঁকা রাস্তার ওপর ঘেউ ঘেউ করতে থাকল অকারণে। শেষ সাইকেল আরোহীকে দেখে, ঘাড় নামিয়ে ঘরে ঢুকল ফাতু। মিছিল এগিয়ে চলল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে···।

এমনি করে বাকি দিনগুলো সাবাড় হয়ে ভোটের দিন আসল। মাঝের দিনগুলোতে কত মিছিল গেল রাস্তা কাঁপিয়ে। কত লোক আসল ফাতুর কাছে। নতুন থান কাপড়, নতুন রঙিন ছাতি, এমন কী নগদ টাকা অবধি দিয়ে গেল একে একে। ফাতুর মত লোকেরও এ সময়ে পোয়া বার অবস্থা। একটা ভোট দেবার মালিকিন তো বটে! এবারে ফাতু সেয়ানা হয়েছে, তাই কেউ কিছু নিয়ে আসলে না করে না বরং, ভাবে—পথে সোনা পড়ে পেলে কানে দিতে তো কুনো মানা নেই।

ঘোষাল গিন্নিও কম যায় না। গতকাল এককাঠা খুদকুঁড়ো দিয়ে বলেছে, কাল তো ভোট, ভোটের দিন আর কষ্ট করে কাজে আসতে হবে না তোকে। শুধু ভোট, ভোট করলে তো আর পেটের ভাত জোটেনা,—এই চাল ভাঙাগুলো নিয়ে যা ফাতু। একা বেধবা মানুষের চলে যাবে ক'দিন। তা খুদকুঁড়ো নিয়ে এসেছিল সে। ঘোষাল গিন্নির একেবারেই যে স্বার্থ নেই তা নয়। স্বার্থ ছাড়া জগত চলে না। তার এখন দু'মাস চলছে; ভাল ভাল খাদ্য খাবারে অরুচি। ফাতুর বাড়ির আমড়া আর কুলের চাটনি বড় সুস্বাদু, এখন টক্ খাওয়ার লুকনো বাসনা থেকেই তার মুখে এতো বিনয়ের ভাব। তা ছাড়া ঘোষালবাবু আগাম মন্ত্র দিয়ে রেখেছিলেন বউ-এর কানে, একটা ভোটের অনেক দাম, ফাতুর ভোটটা যেন আমাদের দিকে আসে। ফাতু তো তোমার ঘরের লোকের মতই—তুমি ওকে ভালো করে বোঝাবে এ ব্যাপারে। গিন্নি অবশ্য পাখি পড়ানো করে বুঝিয়েছে ফাতুকে। ভোটকালে সে যেন প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রী! যে আসছে সেই মাস্টারি করে বুঝিয়ে যাচ্ছে ভোট প্রসঙ্গ।

সেও সবার দেয়া ভোটজ্ঞান নিয়ে মরা ভৈরব নদের মত চড়া পড়া স্মৃতিতে গেঁথে রেখেছে।

বুকভরা ধন্দ নিয়ে ফাতু আজ যাচ্ছে ভোট দিতে। সকাল সকাল রান্না করে; কাঁটা গাংনি শাকের চচ্চড়ি আর আমলির অম্বল দিয়ে খুদ কুঁড়োর জাউ খেয়ে সে যাবার জন্য তৈরি। গায়ে তার নতুন থান কাপড়। অন্য সময় ভদ্র পাড়ার কোন স্ত্রীলোক দাসপাড়ার দিকে পা মাড়ায় না, আজ কিন্তু স্বয়ং ঘোষাল গিন্নি এসে হাজির। বলল, চল ফাতু, ভোটটা আমার সাথে গিয়েই দিয়ে আসবি, চল্—তা নাহলে ভুল করে আবার অন্য কোথাও ছাপ দিবি। তোর যা ভুলো মন !

—চলেন গিন্নি মা। মাথায় ঘোমটা টেনে রঙিন ছাতি খুলতে গিয়ে বাঁধল বিপত্তি। সুইচ টেপা ছাতা খোলার কায়দা তার অজানা। শেষে ঘোষাল গিন্নি ফস্ করে সুইচ টিপে ছাতাটি খুলে ধরিয়ে দিল তার হাতে। বুক চিতনো ভঙ্গিমায় থপথপ ক'রে পা ফেলে সে হাঁটা দিল ভোট বুথের দিকে, পিছনে ঘোষাল গিন্নি চলল লাজুক পায়ে। দাস পাড়ার বিধবা বউ, তায় আবার বাড়ির ঝি—তাই লজ্জায় হাঁটার সময় মাথা তার মাটির দিকে ঝুঁকানো।

প্রত্যেকবারই প্রাইমারী স্কুলেই ভোট বুথ হয়, এবারও হয়েছে। পূব-পশ্চিমের শুঁড়ি রাস্তাটা দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তা ধরে উত্তর বরাবর গেলেই প্রাইমারী স্কুল। রাস্তার ধারে জায়গায় জায়গায় ভোটার তালিকা নিয়ে জোড়া খেজুর পাটিতে ডেরা বেঁধে বসে আছে বিভিন্ন দলের কর্মীরা। ফাতুরা রাস্তা ধরে যেতেই একটা মহানিমগাছের নিচে প্রথমেই পড়ল নির্মলবাবুর ডেরা। মহা-নিমগাছ সাধারণ পাতি নিমগাছের মত নয়। পাশের পাতি নিমগাছের হলুদ রঙের পাতাগুলো ঝরে পড়ছে মৃদু বাতাসে। কিন্তু মহানিমগাছে সাদা পাপড়ি যুক্ত নীলাভ পুষ্পদণ্ডে আট দশটা হলুদ পুঁথির সমাহার। গাছটা ফাতুর রঙিন ছাতাটাকেও হার মানাচ্ছে যেন ! হার মানলে কী হবে, সে আজ হারতে আসেনি তাই, রঙিন ছাতাটা ডান হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে দাঁড়াল নির্মল বাবুদের ডেরার সামনে। নির্মলবাবু বিনম্র গদগদ স্বরে বলল, এসে গেছো ফাতুদি ! তারপর আবার ঘোষাল গিন্নিকে উদ্দেশ করে বলল, কী বৌদি ! শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন তো সব। আপনি যখন সাথে আছেন আমরা নতুন করে কী আর বলবো। ঘোষাল গিন্নি ডানদিকে ঘাড় কাত করে, লিপস্টিক ছাপানো ওষ্ঠাধরে গোলাপ পাপড়ি হেসে, সম্মতির ঘাড় ঝুঁকাল। নির্মল বাবুর শাগরেদ হরিপদ ঘোষাল গিন্নির নম্বর খুব সহজেই ঢুঁড়ে খস্‌খস্ ক'রে সিল্প লিখে দিল। দাসপাড়ার লোকেরা এ ডেরায় আসছে খুবই কম। সেজন্য দাসপাড়ার নাম খুঁজতে দেরি হচ্ছে হরিপদর। নির্মলবাবু কটাক্ষ ক'রে

হরিপদকে বলল, তখন থেকে 'ভোটখুশ' বিড়ি ধ্বংস করছিস খালি, এতক্ষণেও নাম খুঁজে বের করতে পারলি নে! প্রথমে দাসপাড়া বের কর; তারপর থাকবে পদবী, পদবীর পর নাম। হরিপদর ইতস্তত করা দেখে ভোটার তালিকাটা ফস্ করে কেড়ে নিল তার হাত থেকে, দে দে, আমাকে দে দিকিনি। বিনয় গদগদ দাঁত বের করে শুধাল ফাতুকে, ফাতুদি, তোমার নামটা যেন কি? জ্ঞানগম্যি-হীন নিরক্ষর লোকের ভাল নাম ভোটের সময়, জমির দলিল লেখার সময় আর কোর্টে কেস উঠলে প্রয়োজন হয়। ডাক নামেই চেনে সকলে। ভোট ছাড়া বাকি দু'টোর সাথে এদের কোন সম্পর্ক থাকে না সাধারণত তাই, নাম মনে করতে গিয়ে ফাতু পড়ল মহাফাঁপরে! নাম মনে করবার জন্য আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল সে। নির্মলবাবু হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান জিনিস খোঁজা ক'রে চোখ বোলাতে লাগল তালিকাটার ওপর,—হঠাৎই উৎসাহের সঙ্গে বলল, পেয়েছি, পেয়েছি। এ-এই তো। দাস ভাগ্যবতী স্বামী মৃত সুধন্য।...কি ফাতুদি, তোমার স্বামীর নাম সুধন্য তো? দুর্ভাগ্য জড়ানো লজ্জার হাসিতে ভাগ্যবতী মুখ নামাল মাটির দিকে।

ভোটের লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঘোষাল গিন্নি, তার পিছনে ভাগ্যবতী। ফাতু এখন ভাগাবতী হয়ে গেছে! ঘোষাল গিন্নি ভোট দিয়ে রাজ্য জয়ের হাসি মুখে ভোটপত্র ভাঁজ করে ফেলে দিল বাক্‌সে। এবার ভাগ্যবতীর পালা! ঘোষাল গিন্নি ট্যারা চোখ ক'রে দেখল ভাগ্যবতীকে, ভাবটা এইরকম—যেন ভুল করিস্ না বাপু!

টেবিলের ওপর ভোট বাক্‌স। তার কাছাকাছি চারজন লোক। মাঝখানে চশমা চোখে গম্ভীর মুখ করে যিনি বসে আছেন, তিনি প্রিজাইডিং অফিসার। আর তিনজন পোলিং অফিসার। একপাশে বেঞ্চিতে বসে আছে বিভিন্ন দলের একজন করে এজেণ্ট। এরা সবাই ভাগ্যবতীর দিকে অবাক, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাগ্যবতী হাতের নম্বরঅলা স্লিপটি দিতে প্রিজাইডিং অফিসার ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করে সই করে দিলেন ভোটপত্রে। বাঁ হাতের তর্জনীর কোন ঘেষে কালির বিন্দু লাগিয়ে, ভোট দেবার কায়দা-কানুন বুঝিয়ে, ভোট-পত্রটা হাতে দিয়ে সাহায্য করলেন পোলিং অফিসাররা। ভাগ্যবতী ভোটপত্র হাতে পেয়ে; দু'হাত জোড় করে, শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে, ভোট বাক্‌সে মাথা ঠেকিয়ে স্বশ্রদ্ধ প্রণাম করল। দৃশ্য দেখে তো প্রিজাইডিং অফিসার থেকে শুরু করে ঘরের সকলেই হাসতে থাকে নিজ নিজ ভিন্ন ভঙ্গিমায়।

তাকে নিয়ে এ ধরনের হাসি তামাশা ফাতুর গা সওয়া হয়ে গেছে। তাই, সে বীরদর্পে এগোল ঘরের কোনের দিকে চট দিয়ে ঘেরা জায়গার ভিতর।

ভিতরে ঢুকে প্রথমেই হ্যারিকেনের কল ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল সে। হ্যারিকেনের শিখা প্রথমে উস্কে উঠল, তারপর নিভে গেল। হ্যারিকেন নিভে যাওয়াতে তার ভোট দেবার কথা মনে পড়ল। এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ভাবতে লাগল সে, এর আগেউ তো একজনকে ভোট দিয়ে সোনা ফেলে কাঁচে আদর করেচি, ইবারে সব্বাইকে ভোট দিব। প্রথমে বার দুই ছাপ মারল টেবিলের ওপর—শব্দ উঠল খট্‌খট্! এমনিভাবে দেওয়ালের ধপধপ, ঘেরা চটের খসখস শব্দও উঠল বারকয়েক। পাগলপারা ভোটছাপ দিয়ে চলেছে সে। শেষে হ্যারিকেনে ভোটছাপ মারাতে ঘটল যত বিপত্তি। হ্যারিকেন উল্টিয়ে মাটিতে পড়ে কাচ ভাঙার শব্দ উঠল—ঝন্‌ঝনাৎ! ইস্কুল ঘরের মেঝে ভরে গেল কেরোসিন তেলে। ভাগ্যবতী ভ্যাবাচেকা খেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। ভোটপত্রটি তখন তার চোখের জলে ভিজে গেছে।

কালী

কালোর-ঝাড ঘরে এসে আমার বংশটারে ছারখার কোরে দিলে—আমার বাপু ওরকম মেয়ে জন্মালে আঁতুড় ঘরেই গলায় নুন ঢেলে দিতাম। শাশুড়ী একা-একা বিড় বিড় করে।

বউ ঝাঁঝের গলায় বলে, ঢ্যামনা মাগীর তিনকাল গিয়ে এক্ কাল রইচে—ঠাঁঠ দেখলে গা জ্বলে যায় আমার।

—কী বললি? আমার ঠাঁঠ, না? বছরে বছরে একেকটা কালো কুৎসিৎ বিয়োচ্চিস—কুনো লজ্জা সরম নাই রে বাবা!

—লজ্জা আবার কীসের লেগী শুনি?

—ঘরে ত সব এক-একটা বেছন রেখেচিস ; বে' দিতে পারচিস্ একটারো?

—বে দিতে পারি-না-পারি তুর কী? তুকে দেখতে হবে নি। বুড়ি-মাগীর কুনো কাজ কাম নাই, খালি জাবর কাটচে তখন হোতে।

—ওরে, ও নগেন! ও নগ্না! শুনচিস, না কালা হয়েচিস্? বৌ কী অলুক্ষুণে বে-এ···, আবার বলে কিনা আমাকে দেখতে হবে নি! তখুনই বলেচিলাম ওরকুম কালো মেয়ে ঘরে আনিস নে—কালসাপ সাধ কোরে ঘরে তুলেচিস্, এখুন দ্যাখ কী অলুক্ষণটাই লা হচ্চে সম্‌সারের। শাশুড়ি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

নগেন ঘরে বসে শোনে সব। কোন উত্তর দেয় না।

ছাব্বিশ বছর ঘর-সংসার করছে নগেন। মা-র এরকম কথা শুনে শুনে গা-সয়া হয়ে গেছে। ছ-ছটা কালো মেয়ের বাপ সে। চিন্তায় বুকের ভেতরটা কুঁকড়ে আছে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, এ সংসার ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে। অনেক দূরে,—যেখানে কেউ খুঁজে পাবে না তাকে। মেয়েগুলোর মুখের দিকে চেয়ে সে আর কোথাও যেতে পারে না।

প্রথমবার, যখন বউ ছ'মাসের পোয়াতি ; এক রাতে বউ-এর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল নগেন, মা'র মতুন ফর্সা হবে দেখবা!

শাশুড়ী দরজায় আড়ি পেতেছিল ; বুঝি কোনো নিন্দে করছে ছেলে আর বউ মিলে, না হলে রাত কালে আবার মা'র নাম কেনে! বউ-এর মুখ আনন্দে ভরে ওঠে থোড় বেরনো ধান গাছের মতন। একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলের স্বপ্ন দ্যাখে সে। ব্যাটা ছেলে। নগেন বউকে ডানহাতে আরও কাছে টেনে নিয়ে ভরা নদীর জোয়ারের মত আদর করে। আদরের বন্যায় ঘোড়ামুখি ধান

শিসের মত ঘাড় বেঁকিয়ে পেটের দিকে নজর পড়তেই চরম সুখ অনুভব করে বউটা।

সাত সকালে মা ঠাকুমার ঝগড়া শুনছিল কালী। কালী নগেনের বড় মেয়ে। বংশের প্রথম কালো প্রদীপ! জ্বলন্ত প্রদীপের নীচে যেমন ছায়া পড়ে, তেমনই এক অজানা ছায়া কালীর যৌবনটাকে পুড়িয়ে মারছে। দশ দশবার দেখে গেছে ভিন্ন ভিন্ন ছেলের বাড়ি থেকে। ছেলের নাক উঁচু আত্মীয়রা নাকচ করেছে প্রতিবারই। যেন কালো মেয়েদের বিয়ে করতে নেই—বিয়ে হতে নেই। এ রকম মনোভাব নিয়ে সবাই সটকে গেছে। পাত্ররাও কেউ কেউ মুখের ওপরই বলেছে, সবই তো ভাল, কিন্তু মেয়ে বড্ড কালো। ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়। কালী মানুষের মধ্যে ডুবে মরছে, ধরবার মতন অবলম্বন কোথায়? তাই উদাসীন চোখ মেলে সে ভাবে, কুকুর-ছাগলের ও কালো রঙ হয়, তবুও ওদের দাম আছে। আমি কী তবে কুকুর-ছাগলেরও অধম!

শীতকালের সকালে প্রথম রোদে খেলা করছে পাঁচটা কুকুরছানা। এদের মধ্যে চারটেই কালো, একটা সাদা। ওরা সবাই সারিবদ্ধভাবে মা-কুকুরটার পিছু পিছু যাচ্ছে আর খেলা করছে। মা-কুকুরটা ছ'ছটা বাঁট দুলিয়ে চলছে রাজরানীর চালে! নাদুস-নুদুস বাচ্চাগুলোর দিকে চেয়ে কালীর ভারী হিংসা হয় মনে। মনে পড়ে যায় ভাদ্রমাসের এক সকালের কথা। ঘুম থেকে উঠে নিমের দাঁতন ঘষছিল সে। কতকগুলো মদ্দা কুকুর ছুটোছুটি করছিল লাল রঙের একটা মাদী কুকুরের পিছনে পিছনে। শেষে একটা হালকা বাদামী রঙের কুকুর জোড়া লেগেছিল লালটার সাথে। ছোট বোনটা তেড়ে মারতে গেছিল বাঁশের চাঁচারি দিয়ে। তারপর, মাটিতে ঘষটাতে ঘষটাতে সে কি কাণ্ড! বাবা বকাবকি করেছিল ছোট বোনকে—অ্যাই ফুঁচু, আয় আয়, শিগ্গি এদিকে আয়। ভাদুরি কুকুর মারতে নাই। এ দৃশ্য দেখে এবং বাবার কথা শুনে দারুণ লজ্জা পায় কালী। তারপরের খবর আর জানে না সে। মা-কুকুরটাকে দেখল আজ—একেবারে পাঁচ পাঁচটা ছা' সমেত। বাপ কুকুরটা কোথায় গেছে কে জানে! তার কোন খোঁজ জানে না কালী, এমন কী মা কুকুরটারও। লজ্জা পেয়ে বাপের সামনে থেকে সরে এসে উদাস হয়ে কালী ভাবল, তবে যে মানুষে কালো মেয়েদের বে' করতে চায় না—তবে কী মানুষের বিলাতে এ রকম হয় না? বাদামী আর লাল কুকুর দু'টার যদি কালো বাচ্চা হয়, তবে কালো মেয়েদের ফর্সা ছেলে কী হবে নি? ঠাকুমা বুড়িটা তবে মা-রে কালোর ঝাড়

বলে কেনে ? এতসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে মুখ ধুতে যায় বাবুদের বাঁধাঘাটে।

নগেনের বুকে আজকাল হাঁপানির টান। শুধু ভাবে আর হাঁপায়, হাঁপায় আর ভাবে। মনের মধ্যে খুন করার বাসনা জাগে। বাবুদের আটা-কলে কাজ করত সে। বছর দুই আগে ডান হাতটা কাটা পড়ে আটাকলের চলন্ত ফ্ল্যাট্ বেল্টে। করিমপুরের সরকারি হাসপাতালে থাকার সময় নগেন আটাকলের মালিকের হাত ধরে আকুল কেঁদে বলেছিল, আমার কী হবে বাবুগো ? ছেলে-মেয়ে গুলান কেমন কোরে বাঁচবে ?

বাবু বলেছিল, আগে সেরে ওঠ্, তারপর আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

ছ'মাস বাদে ঘরে ফিরে নগেন ভেবেছে, এ বারে বোধহয় বাবুরা আমাকে ভারী কাজ দিবে নি। বাবুদের অবশ্য নগেনকে আর প্রয়োজন হয় নি। নগেনের বদলে খগেন জুটেছিল ইতিমধ্যে। খগেন নাকি খু-উ-ব ভাল কারিগর ! আটাকলের চাকরিটা বরাবরের জন্য চলে গেল, নগেন তখন থেকেই বেকার।

নগেন বেকার হবার পর থেকে সংসারের হাল ধরে কালী। বাড়ির সকলে জানে সে মফঃস্বলে যায় টাইপ করতে, চাকরি করে প্রাইভেট কারখানায়। টাকা পয়সা যা উপায় হয় সবটাই সংসার খরচেই যায় চলে। বাড়ির সবার মুখে ভাত জোটে। কেউ খোঁজ করে না কালীর কাজের। সংসারটাই এরকম—এখানে টাকাটাই সব ! সকলের টাকাতেই শান্তি। একবার খোঁজ করেও দেখে না টাকাটা উপায় হচ্ছে কেমন করে ! একমাত্র কালীই জানে এ সংসারের টাকা কোথ্ থেকে আসে। কালী শরীর বিক্রি করে মফস্বলের কুঠিঘরে। কালো শরীরে তখন ক্ষুধার্ত বাঘের থাবা ! সমাজের কত বড় বড় লোকই না আসে সেখানে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালে ওই কালো শরীরটার লোভে। কালো বলে কেউ ঘেন্না করে না তখন।

দু'টো নাকে-মুখে দিয়ে সকাল সকাল কাজে বেরয় কালী। পরণে নীল শাড়ি, নাকে নাকছাবি, মুখে ক্লান্তির ছায়া, চোখে ভীতির চাহুনি—কালী চলেছে কাজে। যাবার আগে নীচু স্বরে বাপকে বলে, আজ আমার নাইট ডিউটি, আজ রাতে আর ফিরতে পারব নি বাপ। বাপের বুকের ভেতরটা হাউ হাউ করে ওঠে। কাটা হাতের বাহুমূল কয়েকবার নড়ে ওঠে ভীষণ উদ্বিগ্নতায়। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা থরথরিয়ে কাঁপে।

—এ রকম পেরায়ই তু নাইট ডিপুটি করছিস্, শরীরটা যে নষ্ট হয়ে যাবে রে মা ?

এখন বছরের শেষ। আজকাল প্রায়ই নাইট ডিউটি দিতে হয় কালীকে। শরীরটা নষ্ট হয়ে যায় রাতের আঁধারে। নগেন অবশ্য এসবের কিছুই জানেনা।

কিছু জানে না বলেই রাত্তিরে বাঁ হাতে চেপে ধরে বউকে।

বউ বলে, রাত কালে আর ধ্যাস্টামু কর নি তো।

নগেন বউ-এর আদুড় পিঠে হাত বোলায়। অনুনয়ের সুরে বলে, আয়, এট্টুস্ কাছে—

—উঃ—আঃ···বুড়া বয়সেও বাতিক গেল নি!

শাশুড়ী বুড়ি ঠসা কান দরজার সাথে ঠেসে ধরে—বোঝে, নিন্দে হচ্ছে না। মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করে তার। বারান্দার চৌকির ওপর কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে চুপচাপ।

আজও সারা দিনটা সাবাড় হয়ে গেছে টাকা আর শরীরের সম্পর্কে। মন বলে কিছু নেই—শুধু ক্লান্ত শরীরটা ঘুমে ঢলে পড়তে চাইছে কালীর। কিন্তু উপায় নেই। খদ্দের বিদায় করতেই হবে। না হলে কোঠাবাড়ির মাসি তো আর শুনবে না! সময় হলেই টাকার জন্য তাগাদা দেবে। তাই, সন্ধের সময় কালী বসে আছে খদ্দেরের আশা নিয়ে। এমন সময় একটা আবছা পরিচিত মুখ দেখে চমকে ওঠে কালী। খারাপ লাইনের মেয়েছেলের চোখ মানুষ চেনে খুব! সত্যিই মানুষটাকে চিনতে ভুল করেনি কালী। মানুষটা এসেছে ইস্ত্রি করা পাজামা-পাঞ্জাবী পরে। ফুলবাবুটি সেজে। এ রকম একটা পোশাকে সে মানুষটাকে স্বপ্নে দেখেছিল বিয়ের পিঁড়িতে। কিন্তু ঐ ফুলবাবুটিও মেয়ে দেখে 'কালো মেয়ে' বলে নাক উঁচু করে ফিরে গেছিল। কালীর বহু প্রার্থিত স্বপ্নটা কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছিল সেদিন। আজ কামুক চোখে লোকটা চিনতে পারেনি কালীকে। কামুক মানুষ নাকি জ্ঞান হারায়! যখন চোখের ওপর থেকে কামের ছানি যায় কেটে তখন দামী সিগ্রেট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে, আরও ভালভাবে পরখ করে সেই মানুষটা শুধায়, অ্যারে! তুমি মথুরাপুরের নগেন মণ্ডলের মেয়ে না?

—কুন্ নগেন?

—ন্যাকামি হচ্ছে না?

—টাকা ছেড়েচো; শুয়েচো ব্যাস্। অত সব জিগ্যেস্ কীসের, অ্যাঁ?

কথা শুনে আধপোড়া সিগ্রেটটা পড়ে যায় লোকটার হাত থেকে। কালীর দু-চোখে দুটো গঙ্গা ফি-রাতে। এমনি করেই দিনগুলো কেটে যায়। দিন তো এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে না; দিন হচ্ছে নদীর মত, যে স্রোত বয়ে চলে

তা আর উজানে ফিরে আসে না কখনোই। কিন্তু একেকটা দিন এমনভাবে ঘুরে আসে যা নদীর বাঁধের মত আটকে থাকে মানুষের স্মৃতিতে। এমনি একটা দিনের কথা কালী বা নগেন কেউই ভুলতে পারে না! সেদিন নগেন গিয়েছিল গঞ্জে, ভেবেছিল গঞ্জের হাট থেকে মেয়েটার জন্য একটা শাড়ি কিনে দেবে। বেকার জীবন তবু এক টাকা দু-টাকা করে সে প্রায় শ'টাকা জমিয়ে ছিল ছ'মাস ধরে। শাড়ি কিনে সে যখন খুশি মনে বাড়ি ফিরছিল তখন ধোপাবাড়ির সামনের বড় বট গাছটার নিচে দেখতে পেল উগ্র সাজে সজ্জিতা ছ' সাতজন মেয়েকে। মেয়েগুলোর নজর দেখেই গা ঘ্যানর্ঘোনিয়ে উঠেছিল নগেনের। সে কেমন ডরপুক চোখে মেয়েগুলোর দিকে তাকাল। আবার ঘেন্নায় রি রি করে উঠল তার গা। এগিয়ে গিয়ে দেখল, কালীর বয়েসী একটা মেয়ে নাভির নিচে শাড়ি পরে ইশারায় চারটে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে খদ্দেরকে। লোকটা দু-আঙুল উঁচিয়ে হাসছে। কি বিশ্রী তার হাসি! নগেনের পা যেন আঠার মত চিপকে গেল রাস্তায়। বড় বড় দৃষ্টি মেলে সে দেখল, মেয়েটির মুখের সাথে কালীর মুখটা হুবহু মিলে যায়! সন্দেহটা প্রকট হতেই আরও একটু এগিয়ে গেল নগেন। ভালো করে দেখল, বটতলায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা তাদের ঘরের কালীই। নগেনের হাত পা থর থর করে কাঁপছিল। ঝাঁপসা চোখে তার চেনা পৃথিবীর রঙ বদলে যাচ্ছিল ক্রমশ। আর থাকতে না পেরে আর্তনাদের মত ক'কিয়ে উঠল সে, কালী—ঈ—ঈ—ঈ।

কালী চোখ তুলে তাকিয়ে পিন ফোটান বেলুনের মত চুপসে গেল। তার হাতে তখন দুটো দশ টাকার নোট। টাকাটা দ্রুত বুকের খাঁজে লুকিয়ে সে পালিয়ে যেতে চাইল আড়ালে, অন্ধকারে।

নগেনের চোখে সব টুকু আলো মুছে গেল তখনি। সে ক'কিয়ে কেঁদে উঠে নতুন শাড়িটা চেপে ধরল বুকে। ঝাঁপসা চোখে দেখল, ঘুটঘুটে অন্ধকারে তাদের কালো মেয়েটা হারিয়ে গিয়েছে। অন্ধকার যেন অজগর সাপের মত গিলে নিয়েছে আস্ত একটা মেয়েকে।

শত্তুর

বুড়ো মানুষের বাঁচার জন্যে খাওয়াটা হাঁড়িতে মাটি লেপার মতন। এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ফড়িং দাস। বুড়ো বয়সের মূল সমস্যা হল খাওয়া। তাই সাত সকালে শ্রীপদর চা দোকানের সামনে কুকুর কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে আছে সে। যদি দয়া ক'রে ভাঙা লেড়ো বিস্কুট কিম্বা বাসি পাউরুটি দেয়, বুকের ভেতর ছলাৎ ছলাৎ অদম্য এক আশার ঢেউ। চা দোকানের সামনে মুদি-দোকানের বারান্দায় সারারাত তার শোয়া-বসা। রাত ভোর না হতেই ফড়িং লাঠি ঠুকতে ঠুকতে গুটি গুটি চালে চলে আসে চা দোকানের সামনে। একটু বাদে, সকাল হলে বাস স্ট্যাণ্ডের মানুষগুলো ভিড় জমাবে ওখানে। মানুষ গুলোকে আসতে দেখলে ফড়িং ঢ্যাঙা টিনটিনে টসকান শরীরটাকে ঝাঁকি মেরে তাগদ আনার চেষ্টা করে। তখন তার পচা সড়া কাৎলা মাছের মত ঘোলা চোখে ছরৎ (শ্রমশক্তি) হীন ঝিমিকি। পাশে পড়ে থাকা তরলা বাঁশের আড়াই হাতি শুকনো, সরু লাঠিটাতে হাত বোলায়। ওই লাঠিটাই যেন তার শক্তির সাহারা! শ্রীপদ নিত্যদিন ছ্যা ছ্যা করে তাকে। ফাঁদালো ভুঁড়ি নাচিয়ে বলে, যা ভাগ! তোকে দেখলেই খদ্দের ভাগবে। তোর গায়ে যা দুর্গন্ধ! ধুলো কাদা মাখা, মইসা ধরা ত্যানা জড়ানো ঝাঁকড়া মাকড়া দেহটাতে ফড়িং তাগদ আনার চেষ্টা করে। লাঠিতে ভর দিয়ে মাথাটা ফাৎনার মত ওপর দিকে তুলে বলে, বাবু গ! কৎদিন হ'ল প্যাটে ভাত পড়েনি—এটুস পাঁউরুটি দ্যান না, বাবু।

—নিত্যদিন ঘ্যানর ঘ্যানর করা আর নতুন নতুন ফ্যাচাং। একাই শ্রীপদই কি ঠিকা লিয়ে রেখেচে বাজারময় লোকের?—যা তো নাড়ু, মেরে ভাগা বুড়োটাকে। শ্রীপদর বিরক্তি ঝরে পড়ে। চা দোকানী শ্রীপদ আগে তবুও দু'এক টুকরো পাউরুটি কিংবা লেড়ো বিস্কুট দিত। এখন আর দেয় না। পচা· সড়া পাউরুটির টোপ বড়শিতে গেঁথে ছিপ ফেলে পুকুরে। এখন তার নতুন নতুন মাছ ধরার নেশা। তাই পাউরুটি ফড়িংকে দিয়ে নষ্ট করতে চায় না।

নাড়ু আবার এককাঠি ওপরে যায়। বাঁশের চাইতে কঞ্চির দড় হাবভাব। চেলা-কাঠ উঁচিয়ে মারতে আসে ফড়িংকে। ওইটুকু ছোঁড়ার কাছেও সে যেন চোঁতা মানুষ! ক'দিন আগে ছোঁড়াটা ঘা কতক বসিয়ে দিয়েছিল রুটিবেলা বেলুন দিয়ে। কালসিটে পড়ে গেছে ফড়িং-এর পিঠটাতে। কালসিটে পড়া দাগটা এখনো অবদি স্পষ্ট হয়ে লম্বালম্বি উঁচু হয়ে ফুলে আছে। কুমরে

পোকার মাটির ঘরের মত। সেদিন থেকে ছোঁড়াটাকে মারমুখী হতে দেখলেই ভয়ে কুঁকড়ে মুকড়ে ছোট হয়ে যায় সে। তার ওপর ছোঁড়াটার মুখে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। অশ্লীল ভাষায় কবি করতেও ছাড়েনা! 'শ'কার-'ব'কার ছাড়ে ফড়িং-এর উদ্দেশে। সেও ঘা সওয়া মানুষ। কোন রকম টেণ্ডাই-মেণ্ডাই করে না। কুয়োতলার ছাতলার মত ছানিপড়া ঘোলা চোখে নাড়ুর দিকে তাকায়। নাড়ুটা আগে ভালই ছিল। না খেতে পাওয়া মানুষ দেখলে এমন ছ্যা ছ্যা করত না। গালাগালিও দিত না। স্মৃতি আঘাত দিত কলজেতে। দোকানে কাজে লাগার আগে তারও দু'বেলা পেট ভরে খাবার জুটত না। কিন্তু মানুষের জীবন হচ্ছে পাড়ভাঙা নদীর মতন! নতুন খাতে বয়ে চলে, ভুলেই যায় পুরনোকে।

—অ্যাই বুড়া, ভাগ্। যা শালা দুকানের ছামু হোতে!

ধমকের সুরে কথাগুলো ব'লে চোখ মটকায় নাড়ু।

নাড়ুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল ফড়িং। শুকনো থুতুর ঢোক গিলে কাঁপা গলায় বলল, ক্লুটমুট মারিসনি নাড়ু। কংদিন হল ভাত খাইনি। শরীলডা খারাপ নাগছে। তা' জন্যি টুকুন পাঁউরুটি মাঙচি।

—ভাগ, ভাগ বলছি। নাড়ু চেলা-কাঠ উঁচিয়ে তেড়ে গেল ফড়িং-এর দিকে। পাশে পড়ে থাকা লাঠিটাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফড়িং। মনে মনে ভাবল, অ্যাখুন বুড়া হয়েচি বলে এ্যাতোটুকুন ছোঁড়াটাও আমার শত্তুর! ভগবান এর বেচার করবে।

—আবার দাঁড়িয়ে আচিস কেনে? যা ভাগ কেনে, জল্দি! দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে নাড়ু। মাটিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ফড়িং ধীরে ধীরে এগোল আঁকাবাঁকা পথ ধরে। তখন তার কলজেটাতে একনাগাড়ে লাঠি ঠোকার তড়পানি!

তা, কলজেতে তড়পানি হবারই কথা। বছর পাঁচেক হল বউ-এর ফুসমন্তরে ভিনো হয়ে গেছে বড় ছেলে লালটু। এখন লালটু শহরে থেকে ভাল কামাচ্ছে। সেখানে তার হোটেল ব্যবসা। প্রথম প্রথম দু'এক বছর বাড়ি আসত যেত। ফড়িং ভিটে বাড়ি বেচে দেবার পর থেকে গাঁয়েই পা মাড়ায় না ছেলেটা। এমন কী খোঁজখবর নিতে গেলে মেনিমুখো হয়ে বলে, এখেনে আর আমাকে জ্বালাতন করতে এসোনি, বাপ। তুমার বৌমা দেখলে রাগ করবে। বড় অশান্তি হবে আমার সনসারে। এ ধরণের কথা শুনে কোন বাপ আর দাঁড়াতে পারে সেখানে? তবুও নাতি-নাতনিগুলোকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য ফড়িং-এর মনটা আঁকুপাঁকু করে। তখন সে উঁকিঝুঁকি মারে হোটেলের পিছনে লালটুর ঘরটার দিকে। বউ কোনরকমে দেখেছে তো আর রক্ষা থাকে না। বাপের সামনেই লালটুর ওপর ঝালঝাড়ে, তুমার সনসার নিয়েই তুমি থাক! আমি কালকেই

ছেলেপিলে নিয়ে চলে যাব বাপের কাচে। আমার আর অতো ঝালাপালা ভাল্লাগেনি।

ছোটছেলে কালটুও কম যায়না। গোঁয়ার গোবিন্দ। বেদাঁড়া। বছর তিনেক হল গাঁ ছেড়ে সে চলে গেছে শহরে। যাবার সময় বলেছে, তুর ছোট-নোকী কাজ আমার দ্বারা হবেনি বাপ। আমি শহরে যাব। নোকরি করব। ফড়িং অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে, শহরে যাসনি ছোটখুকা। ওখেনে গেলে গাঁয়ের মানষের দিল জ্বলে পুড়ে খাক হয়। শহর ভালো মানুষ গিলে নেয়। তবু কালটুর একগুঁয়ে উত্তর, আমি যাবই যাব। ফড়িং বুদ্ধি দেবার সুরে বলেছিল, শহর হচে আস্তার (রাস্তার) আলার মতুন। দেখিস নি—বাদলা-পুকা গুলান ক্যামুন আলা দেখে ছুটে ছুটে যায়। তা'পরে জ্বলে পুড়ে ম'রে মাটিতে পড়ে। তার চে আমি যা বলচি শোন্,—ভাগাড়ের কাম কর। আমাদের পাঁচ পুরুষের কাম, চাম কাটার কাম। ই কামে—

কালটু কথার মধ্যে কথা পেড়ে বাঁক দেওয়া মোরগের মত ঘাড় বেঁকিয়ে বলেছিল, ধ্যাত্তিরি! চুপ যা,—আমি যাবই। কেউ এঁটকুতে পারবেনি আমাকে। বাপের সাথে রাগারাগি করে সেই যে গাঁ ছাড়ল কালটু আর গাঁমুখো পা বাড়াল না। এখন বাসের ক্লিনারের কাজ করে সে। কখনো সখনো ফড়িং এর সাথে দেখা হলে ঘাড় ফুলিয়ে বলে, কণ্ডাকটর হব, ড্রাইভার হব। আকাশ-চুম্বী উচ্চাশায় তখন চকচকায় কালটুর চোখদুটো। এসব কথার উত্তরে ফড়িং বলে, ভাগাড়ের চামকাটা কাজটা ভাল ছেল রে ছোটখুকা। দিলটা ক্ষামি হতোনি তা'হলে। ভাগাড়ের নাম শুনলেই কালটুর চোখদুটো ফসফরাসের মত জ্বলে ওঠে।

পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল ফড়িং। বুড়ির কথা মনে পড়ল তার। ডানদিকে ঘুরে ঘোষাল বাড়ির দিকে পা বাড়াল সে। যখন পৌঁছল, তখন বারান্দায় উঁচু হয়ে বসে ভিজে ভাত খাচ্ছে বুড়ি। সঙ্গে মিষ্টি ডাঁটার তরকারি আর চারাপোনার ঝোল। বুড়ি গো-গ্রাসে গিলছে সড়াৎ সড়াৎ শব্দে। দূরে থেকে দেখেই ফড়িং-এর জিভে জল এল। সে হাত দশেক দূরে দাঁড়াতেই হাত নেড়ে বুড়ি নিষেধ করল, যাও দিকিনি,—জ্বালাতন করতে এসোনি। গিন্নি মা দেখলে রাগ করবে। কাজ হোতে ছাড়িয়ে দেবে। ফিসফিসিয়ে মুখ নীচু করে কথাগুলো বলল তার ঘরের বুড়িটা।

—কৎদিন ভাত খাইনিরে ভামনী! প্যাটের ভেতরটা শুলোচ্চে। ফড়িং-এর তখন ভোকছানির ভাব। নতুন করে চাগাড় দেওয়া ক্ষিধের জন্যে পেটের জ্বলোনি আরও বাড়ে।

—তুমার মতুন লুভো মানুষ দেখিনি বাবা। কাম কুঠিয়া ভেড়ে কুথাকার!

খেতে পাবা কী করে ? গতর খাটাই প্যাটভাতা খাই,—কাম হোতে ছোড়িয়ে দিলে কী খাব ? ফড়িং সামনে দু'পা এগোতেই তার দিকে আড়াল করে ঘুরে বসল ভামনি, এললোৎ কুথাকার ! ক'দিন আগে যে পরান ঘোষের বাড়িতে ভোজ খেলে ? বাপরে তবু খাঁই মিটেনি !

—ভোজ বাড়িতে কাঙালরা খেতে পায় না রে। বাবুদের আর বেশী জিনিস বাঁচেনা,—হিসেব করে রাঁন্দে। কুকুরগুলানই খেতে পায় না ভাল মতুন। ঝগড়া ঝাঁটি করে তো মানুষে খাবে কী! ফড়িং ডান হাতের চেটো দিয়ে শিগনি মুছতে মুছতে বাঁ হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে। ডান হাতের মাঝের আঙুল দিয়ে চোখের কোনের পিঁচুটি মুছতে মুছতে কাৎ হয়ে তাকাল ভামনির ভাতের থালার দিকে। ক্ষুধার্ত মানুষ সামনে খাবার দেখলে তার ক্ষুধা আরও তীব্র হয়। ফড়িং-এর খিদের চোটে পাটকেলে কামড়ে দেবার অবস্থা তখন। সে কাঁপা গলায় বলল, আমার যে প্যাটের আগুনে বেগুন পুড়ে রে ভামনী।

থালার কানায় হাতের তালুর সকড়ি চেঁচে ভামনি বলল, তুমার ক্ষুরে দণ্ডবৎ! বৌকে খেতে দিবার মুরোদ নাই সে আবার বিটাছ্যালা কিসের! অ্যাঁ ? খাবার সোময় ছুঁকছুঁক কর খালি! গিন্নি মা দেখতে পেলে কাজ হোতে ছেড়িয়ে দিবে কিন্তুক,—তা'লে খেৎ দিতে পারবা ?—পারবানা। প্যাটভাতায় কাজ করচি বলে দু'টো প্যাটের ঠিকা ত নেয়নি বাবুরা।

ফড়িং কোনই রা কাড়ে না। লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ঠুকঠুক করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে থরথরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেল সে। ছ্যানি পড়া চোখ থেকে আবছা আলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। হঠাৎই থেমে দাঁড়াল সে। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল ফিটকিরি রঙের দু'ফোঁটা জল। সিক্ত চোখে মাথা নুইয়ে তাকাল পেটের খোঁদলের দিকে। তখন খোঁদলা পেটটা চাকু দিয়ে ফালাফালা করে দেখতে ইচ্ছে জাগল তার! ওই খোঁদল পেটটা যেন তার কাছে এখন দুনিয়ার সব চাইতে বড় শত্তুর!

অধিকার

আকাশে শঙ্খচিল পাক মারলেই গোকুলপুরের কুকুরগুলো ছোটে কসাই ব্রীজের নীচে কাঁসাই নদীর চরে। কুকুরগুলোর পিছনে আলপথ ধরে ধরে এগোয় হাবলা। হাবলার পিছনে পিছনে হুপো আর রানী। রানী হুপোর দশ বছরের বোন। রানী যে বার জন্মাল তার বাপের আয় বাড়ল। তাই বাপ সখ করে নাম রাখল রানী। রানী আকাশের দিকে মুখ করে চিলের পাক মারা দেখতে দেখতে হাঁটছে। হুপো বলল, অ্যাই রানী! উপর মুখো তেকিয়ে হাঁটিসনি, হুঁচোট খাবি।

—দ্যাখ ক্যাতগুলান চিল একসাথে পাক মারচে। দেখচিস দাদা মাঝে মাঝে ছুঁ মেরে পডচে নদীর জলে! আজ বোধায় অ্যানেক খেতে পাব জানিস।

—তোর মাথা! একটুকরা মানসের নোভে কতগুলান চিল ছুঁ মারে জানিস? চ না, গেলেই দেখতে পাবি।

—নারে দাদা। সিবারের কতা মনে নেই তুর,—সিবারেউ ত কতগুলান চিল উড়ছেল আকাশে। তা' পরে ক্যাতগুলান কোরে মানসো খেলাম বল। অ্যাত্ত অ্যাত্ত ভাত ফেলেছেল বাবুরা. কুড়িয়ে নে' গেলাম পুঁটলা বেঁধে।

—তোকে অত বক্‌বক্ করতে হবেনি। চোপ ত, না'লে ছামুতে কাঁটাগাছ দেখেচিস, পায়ে হিনবে। রাস্তাপানে চোখ রেখে হাঁটত। দেখছিস হাবলা কৎদুর চলি গেল। চ চ তাড়াতাড়ি চ! না' লে বাবুদের ফেলে দেয়া রানগুলান নষ্ট করবে কুত্তাগুলা।

ওরা যখন নদীচরে পেঁছাল তখন সব পিকনিক-পার্টি আসেনি। পরের মেদিনীপুর লোকালে আসবে। যারা ফার্স্ট লোকালে এসে গেছে, তারা জায়গা দখল নিয়ে গোল হয়ে বসেছে একেক জায়গায়। সকাল হয়েছে। সূর্যের রুপালী নরম গুঁড়ো গুঁড়ো আলো নদী চরের বালির ওপর পড়ে ঝলমল করছে। একটা পিকনিক পার্টি এর মধ্যেই মুরগি কেটে ধুতে গেছে নদীর জলে। তার ওপরেই দশ-বারটা চিল পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে। দু' একটা ছোঁ মারার জন্য পাখা গুটিয়ে তীব্র গতিতে নিচে নেমে আসছে জেট বিমানের মত। হাবলা চিল চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ঘাড় উঁচু করে। হুপো আর রানী বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে চোখ ঘুরিয়ে দেখছে চারধারে। কুকুরগুলো সন্ধানী দৃষ্টিতে ছুটছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। হঠাৎই থেমে গিয়ে সবাই মিলে ছুট লাগাল পুব বরাবর বড় শিমুল গাছের নীচে। ওখানেই পিকনিক পার্টির কাটা মাংসের পরিত্যক্ত

অংশগুলো পড়ে আছে। রানীর দৃষ্টি কুকুরগুলোর দিকে। হুপোকে বলল, চ হুই তুলাগাছ তলায়। মনে লাগচে উ:খেনেই ফেলেচে সব।

হুপো বলল, তুই ঠিক বলেচিস রানী—চ'ল ছুট নাগাই। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগায় দুজনে। উদ্দেশ্য কুকুরগুলোর মুখ থেকে পরিত্যক্ত মাংস কেড়ে নিয়ে পুঁটলি বাঁধা। হাবলা হাঁ করে তাকিয়ে ছিল, যেখানে চিল উড়ছিল সেই দিকে। হুপো আর রানীর ধপাধপ দৌড়ের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল সে। ওদের হাত কুড়ি পিছনে হাবলাও দৌড় লাগাল। শিমুলতলার দিকে লক্ষ রেখে তীব্র দৌড় প্রতিযোগিতা চলছে যেন সবার মধ্যে। মাটিতে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত খাবারে মানুষের চেয়ে কুকুরের অধিকার বেশী! মাংসের টুকরোগুলো মুখে নিয়ে কুকুরগুলো খানিকটা দূরে বসে পড়ল। সামনের দু'পায়ের থাবায় চেপে ধরে হিংস্র লোলুপ ভঙ্গিতে চিবোতে থাকল কাঁচা মাংস। রানী অভিমানের গলায় বলল, কুকুরগুলান খুউব বজ্জাত, নারে দাদা?

হুপো উত্তর দিল, দাঁড়া, বজ্জাতি থামাচ্চি ওদের। বলেই পাশেই মাটিতে পড়ে থাকা গাছের শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিল হাতে। ডাল কুড়নো দেখে কুকুর গুলো ভয়ের দৃষ্টিতে তাকাল, ল্যাজ গোটাল পিছনের দু'পায়ের ভাঁজে কিন্তু খাবারের টুকরোর অধিকার ছেড়ে দৌড়ল না।

—হেই, হেই, শালার কুত্তা! আমাদের মানসো খাচ্চিস? শুকনো ডাল উঁচিয়ে তেড়ে মারতে গেল কুকুরগুলোকে। কুকুরও মহা ধূর্ত। মাংসের টুকরো মুখে নিয়েই লাগাল ভোঁ দৌড়। কুকুরের পিছনে হুপো, হুপোর পিছনে রানীও ছুটল। কিন্তু হতাশ হল তারা। ঈর্ষার দৃষ্টিতে দু' ভাই বোন তাকিয়ে রইল কুকুরগুলোর দিকে।

এরমধ্যে হাবলাও এসে পেঁছিল জায়গাটাতে। হুপো কুকুর তাড়াবার সময় একটা কুকুরের মুখ থেকে পড়ে গেছিল হলুদ রঙের ছোট্ট একটা রাং। হুপো আর রানীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে রাংটা। কুকুর তাড়াতে তাড়াতে হাত কুড়ি এগিয়ে গেছিল তারা দু'জনেই। হাবলার সন্ধানী দৃষ্টিতে ফাঁকি পড়ে নি রাং-এর টুকরোটা। কোমরে গোঁজা পলিথিনের প্যাকেট বের করে যেই না ভরতে গেছে ওটা অমনি পিছন ফিরে তাকাল হুপো। চিল চিৎকার শুরু করল, অ্যাই হাবলা, ভাল হবেনি বলচি। মানসো নিবিনে।

—আমি কুড়িয়ে পেয়েচি, এ মানসো আমার।

—আমি এতো কষ্ট কোরে কুকুর তেড়িয়েচি আর বলচে, মানসো আমার! তোর বাপের মানসো শালা!

—অ্যাই হুপো! আমার বাপ তুলে খিস্তি দিবিনে বলচি। মেরে খলপা নড়িয়ে দিব।

—তা'লে আমার মানসো আমাকে ফেরত দে। আমি কুকুর তেড়িয়েচি, ও মানসো আমার।

—আমার বললেই হলো? মাটিতে পড়া জিনিস যে আগে পাবে তার।

—কুকুরগুলানও ত আগে কুড়িয়ে খাচ্চিল। তা'লে ও মানসো কুকুর-গুলানের বলচিস?

—ধুর, বোকা কুথাকার! কুকুর আর মানুষ কি এক হলো? আমরা ত আর কুকুরের ভাষায় ওদের সাথে ঝগড়া করতে পারিনে। দেখচিস নে, যে কুকুরটা আগে কুড়িয়ে পেয়েচ সেটাই খাচ্চে,—উরা ঝগড়া করচে? তুই দেখচি কুকুরেরও অধম!

—কুকুরের নিয়ম আলাদা, মানুষের নিয়ম আলাদা। বেশী চালাকি করিস নে হাবলা। আমার মানসো আমায় ফিরিয়ে দে কিস্তুক।

—বউনির মানসো কুড়িয়েচি। আমি ফেরত দিব না। যা,—যা করতে পারিস কোরে নে আমার।

হাবলার এ কথাটা শুনে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে রানী। দু'হাতে তর্জনী দিয়ে জল গড়ানো দু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুছতে মুছতে রানী বলে, অ্যাঁ-আঁ-অ্যাঁ। আমাদের মানসো দিলে নি! হাবুলদা একটা বদমাশ। অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ!

রানীর কান্নাতে বিপদে পড়ে হাবলা। বলে, কাঁদিস নে রানী। বাড়ি যাবার সময় তুই এট্টা রান নিস।

হুপো সমঝোতার গলায় বলে, তা'লে কিস্তুক সুদ লাগবে। অতক্ষণ রাখবি মানসোটা। এট্টা মানসো বেশী নাগবে কিস্তুক।

—মানসো কি ট্যাকা নাকি?...কাচে রাখলে সুদ নাগবে? বউনির কুড়ুনো মানসো তাই। তা না'লে কক্ষুণো রাখতাম নি সাথে।

হাবলার সান্ত্বনার কথা শুনে রানীর কান্না থামে।

সেকেণ্ড লোকালটা এয়ার প্রেসার হর্ণ বাজিয়ে থামে। এখানে কোন প্ল্যাটফর্ম নেই। মানুষগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ট্রেন থেকে নামছে। মিনিট দুই থেমে সবুজ রঙের লোকাল ট্রেনটা কসাই ব্রীজ পেরিয়ে চলে যায় মেদিনীপুরের দিকে। রেল লাইনের দুপাশে পিকনিক করতে আসা মানুষের ভিড়ে ভরে যায়। সাথে হাঁড়ি-কড়াই-হাতা-ছানতা-কাঠ। একেকটা দল বেঁধে এগোতে থাকে মানুষগুলো।

অতগুলো মানুষ আসা দেখে রানী আনন্দিত হয়ে বলল, দেখেচিস দাদা। ক্যাত নোক! আজ আমরা অ্যানেক খেতে পাব জানিস,...কী দারুণ মজা হবে না রে!

উদাস গলায় হুপো বলল, ধ্যাৎ! আজকাল বাবুরা আর জিনিস ফ্যালেনা।

বাজারে জিনিসের দামে আগুন লেগেচে। দেখচিস নি পাখ পাখালি কুকুর বেড়াল গোরু মোষের স্বাস্থ্য আমাদের মতুন প্যাকাটি হচ্চে। পশু-পাখির তাউত অ্যানেক অ্যানেক জিনিসই খায়। সেগুলা ত মানষে খেতে পারেনা। উরা তবুও বাঁচবে…ইরকম হলে আমরা না খেতে পেয়ে মরে যাবরে রানী।

—দেখেচিস দাদা? বাবুরা ক্যাত্তক্যাত্ত জিনিস এনেচে।

—উসব বাবুদের হিসেবের মাল। বাবুরা এ্যাখুন হিসেব কোরে চলে… জিনিস ফ্যালে না।

—এ্যাখুন বাবুরা খুবই বজ্জাত হয়েচে নারে দাদা?

কিছু সময়ের মধ্যেই নদীপাড়ের জায়গাটা পিকনিক করতে আসা মানুষে ভরে যায়। এর মধ্যে অনেকগুলো দলই মুরগি কাটছে এখানে সেখানে। কুকুরগুলোও আর এক জায়গাতে জটলা করছে না। ওদের এখন খুব মজা! ভাগাভাগি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন মাংস কাটা দলের পাশে। এখন মানুষ গুলো সরে গেলে কুকুরের সাথে লড়াই করতে হবে পরিত্যক্ত মাংসের দখল নিতে। কয়েকটা দল নদীর পাড়ে মাংস ধুচ্ছে রগড়ে রগড়ে। আকাশের চিলগুলোও আর দল বেঁধে পাক মারছে না। ছিটিয়ে ছড়িয়ে একা একা পাক মারছে। মাঝে সাঝে ছোঁ মেরে নিচে নেমে আসছে মাংসের লোভে। ওদের মধ্যেও এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমে এসেছে। সকালের দিকে, একটা মাংস ধোয়া দলের ওপর উড়ছিল অনেকগুলো চিল। এখন একেকটা চিলের অধিকারে দু-তিনটে মাংস ধোয়ার দল!

একটা মাঝারি পলিথিনের প্যাকেট ভর্তি হয়ে গেছে পরিত্যক্ত কুড়নো মাংসের টুকরোতে। রানীর খুউব মজা! মাকে গিয়ে বলবে, মা, দ্যাখ্ ক্যাত্ত মানসো এনেচি। ঘরে ওদের মা অসুস্থ। আগে ঝি গিরি করত চাকরি বাবুদের কোয়ার্টারে। এখন স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পাটকাঠি হয়েছে কালব্যামোতে। কাশতে কাশতে বাসন মাজা, ঘর মোছার কাজ চালাচ্ছিল ওদের মা। বাবু গিন্নির পছন্দ না কাশব্যামো। তাই বলেছে, আমার ঘরে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে। তোর কাশব্যামোর লক্ষণ ভাল না রানীর মা। কাল থেকে তোকে আর কাজে আসতে হবে না…আমরা অন্য ঝি দেখছি।

রানীর মা আকুল গলায় কেঁদে বলেছে, কাজ হোতে ছোড়িয়ে দিবেন নি গিন্নিমা। তালে ছেলেপিলেগুলান যে না খেয়ে মরবে।

—তোর ছেলেমেয়ে না খেয়ে মরলে আমি আর কি করবো বল? তাই বলে জেনেশুনে ঘরে রোগ পুষতে পারি না। না, না, আমি ওসব জানিনে বাপু! অসুস্থ ঝি রাখা মানে ঘরে সাধ করে রোগ ডেকে আনা। তোর রাজরোগ হয়েছে মনে হচ্ছে রানীর মা। আমি আর তোকে রাখতে পারব না।

কুড়নো মাংসের ভরা প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে বাপের কথা মনে পড়ে হুপোর। খড়্গপুরের 'দাদা' বাবুরাওয়ের দলে রেল ইয়ার্ডের চুরি করা মাল পাচার খালাসির কাজ করত বাপ। আর পি এফের সাথে বাবুরাওয়ের হিসসার লড়াইয়ে রাইফেলের গুলিতে কলজেটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল একরাতে। বাপ চিৎ হয়ে মরে পড়েছিল ইয়ার্ডের পাশের রেললাইনের ধারে। পরদিন সকালে বাপকে খুঁজতে গিয়ে এদৃশ্য দেখে হুপো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল রেললাইনের ওপর। জ্ঞান ফিরলে, উঠে দাঁড়িয়ে, প্রতিজ্ঞা করেছিল, বাপ গ! এর প্রতিশোধ আমি নেবই একদিন। তুই ত আর চুরি করতিস নে। চুরি করা মাল খালাসের কাজ করতিস। সে মাল বেচা টাকা চলে যেত বাবুরাওয়ের ঘরে। তুই ত সামান্য মুনিশ ছিলি। তবুও উরা কেনে তুকে মারল? বাবুরাও আর মহাজন চুরি করা মালের টাকায় দু'তালা বাড়ি হাঁকাচ্ছে। তবুও উরা বাবুরাওদের মারে না। তুকে মারল। আমি বড় হয়ে এর প্রতিশোধ নেবই নেব···দেখে নিস।

গত বছর হুপোরা বাসন মেজে দিয়েছিল। বাবুরা বেচে যাওয়া খাবার দাবার দিয়েছিল খেতে। দু' ভাই বোনের সন্ধানী দৃষ্টি খুঁজতে লাগল ওরকম ধরণের বাবুদের। ওরা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল বিভিন্ন দলগুলো। ওদের ঘোরাফেরা করতে দেখে একটা হাঁড়িমুখো বাবু গিন্নি সন্দেহের দৃষ্টিতে ঠারে-ঠোরে দেখাল দলের অন্য লোকদের। কাছাকাছি যারা বসেছে তাদের ফিসফিস করে বলল, অ্যাই, তোমরা সাবধান কিন্তু। ওই ছোঁড়াগুলোর ধান্দা খারাপ··· দেখছো না গায়ে কেমন ছেঁড়া ফাটা তেলচিটে জামা, চোখগুলোতে কেমন ছোঁক ছোঁক হাবভাব। ওরা কিন্তু সুযোগ পেলেই···

গোঁফ কামানো ফর্সা, সুন্দর চেহারার ওই দলেরই অন্য একজন মাঝবয়সী বলল, না, না। তোমাদের এটা ভুল ধারণা। ছেঁড়া খুঁড়া জামা পরলেই গরিব মানুষ হলেই তাদের স্বভাব চরিত্র খারাপ হয় না। আর তা ছাড়া, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আবার···

হাঁড়িমুখো বাধা দিল, তুমি একটা পাগল! কিছু জান না দেশকালের অবস্থা। চোরে চোরে দেশ ছেয়ে গেছে। বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলোকে চুরির কাজে লাগায় ওদের বাপ-মা যাতে কেউ সন্দেহ না করে। ওরা রক্তবীজের ঝাড়। আগাছার বাড় বড় বেশী হয়। বুঝলে?

মাঝবয়সী রসিকতা করে, বৌদি, সাবধান! তোমাদের পট্টি খুলে দেব কিন্তু।

—দাও না খুলে। আমরা কি চোর না কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমরা চোরই তো। তোমরা হচ্ছ ভদ্র চোর! কেন

তোমার বর চুরি করে না? ঘুষ নেওয়াটা কি অধিকার? অফিসে ঘুষ খেয়ে তোমরা দো'তলা বাড়ি হাঁকাচ্ছ না? তার বেলায়—

দলের অন্য একজন বয়স্ক ভদ্রলোক থামাল ওদের, আ হা হা! তোমরা এবার থাম তো। না হলে পিকনিকের মৌজটা এক্কেবারে ফৌত হয়ে যাবে। কথাটা শুনে ওরা দু'জনেই থামল। কিন্তু হাঁড়িমুখো গোঁজ হয়ে বসে থাকল মাটির দিকে মুখ নামিয়ে। সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়েছিল, আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। হাতের ইশারা করে কাছে ডাকল হুপো আর রানীকে। বলল, অ্যাই, তোরা আমাদের বাসনগুলো মেজে দিবি? তাহলে তোদের খাবার দেব। ওদের দু'জনের কাছে এ প্রস্তাবটা তো মেঘ না চাইতেই জল পাওয়ার সামিল। হুপো খুব উৎসাহের সাথে বলল, আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু। মেজে দিব।

—তবে তোরা তফাতে দাঁড়া। আমাদের সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মেজে দিবি'খন।

—আইজ্ঞে, তাই দাঁড়াচ্চি বাবু। বলে, হাত কুড়ি দূরে একটা গাছের নীচে বসতে বসতে হুপো রানীকে বলল, উই বাবুটা কী ভাল রে!

মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ে রানী বলল, এট্টা-দু'টা বাবুনোক খুব ভাল হয়।

অনেক সময় ধরে বসে থেকে ওরা বুঝল, বাবুদের খাওয়া হতে অনেক দেরী আছে। দু'জনে গাছতলাটা থেকে উঠে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে লাগল নদীচরে। ঘুরতে ঘুরতে, হঠাৎই নদীচরের বালির ওপর চকচকে মতন কী যেন একটা দেখে রানী ছুটে গেল ওটা কুড়তে।

—দেখছিস দাদা, এট্টা হার পড়ে আচে এখেনে। মনে নাগচে সোনার হার!

—দূর বোকা! সোনার হার না ছাই! সোনার জিনিস আবার মাটিতে পড়ে থাকে নাকি?

ঝুঁকে হারটা তুলে রানী হুপোকে দেখাল। আশার গলায় বলল, হারটা যদি সোনার হয় তা'লে খু-উ-ব ভাল হবে না দাদা?

—কেনে রে?

—হারটা বেচে মাকে বড় ডাক্তারের কাচে নি যাব। মা'র অসুখ ভাল হবে তা'লে? হারটা সোনার হলে ক্যাত দাম হবে?

—সে অ্যানেক হবে।—অ্যানেক টাকা। নে নে, এখন ওটা গেঁজেতে নুকিয়ে রাখ ত।

—না-না, গেঁজেতে রাখব না,—দাদারে! দে, মানসোর ঢোপটা দে। হারটা কুড়নো মাংসের ভেতরে লুকিয়ে রাখল রানী।

সুন্দর মত যে বাবুটা বাসন মাজার বদলে খাবার দেবার কথা বলেছিল,

ডাকল ওদের, অ্যাই, আয় আয়, শিগ্‌গির। আমাদের আবার ঘরে ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি।

ওরা দু'জনে দৌড়ে এসে দাঁড়াল বাবুদের সামনে।

—আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তাড়াতাড়ি কর। ট্রেন আসার সময় হয়ে আসল যে।

হাঁড়ি-কড়াই গুলো দু'জনে ধরে তুলতে চেষ্টা করল। পারল না। খুবই ভারী।

হুপো বলল, অ্যাই রানী, হাবলাকে ডাক ত। বলবি, আমাদের সাথে কাজ করলে আমাদের খাবার হোতে ভাগ দিব তা'লে। হাবলা হাপুস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পাশেরই পিকনিক বাবুদের খাওয়ার দিকে। কাছে ছুটে গিয়ে রানী বলল, হাবুলদা! তুই আমাদের সাথ দিবি তা'লে আমাদের পাওনা খাবার হোতে ভাগ দিব তুকে।

—তুরা আবার খাবার কুথায় পেলি?

রানী আঙুল নির্দেশ করে, হুই যে, উই বাবুদের বাসন মাজলে অ্যানেক অ্যানেক খাবার দিবে বলেচে।

—চল্‌ তা'লে।

রানী আর হাবলা কাছাকাছি আসতেই হাঁড়িমুখো বাবু-গিন্নিটা হঠাৎই নিজের গলায় হাত দিয়ে আঁৎকে উঠল, ওই যা! আমার হার?

দলের একজন যুবতী মেয়ে বলল, তাইতো বৌদি! একটু আগেই তো তোমার গলায় দেখলাম। হারটা কোথায় গেল? খোঁজ তাড়াতাড়ি, না হলে হয়তো পাবেই না আর!

পুরো দলটার ভেতরে ফিসফিসানি শুরু হল। সবাই অন্য সবাইকে সন্দেহ করতে লাগল। সকলেই যে যার নিজের ব্যাগ আঁতিপাতি করে খুঁজতে শুরু করল। বলা তো যায় না, কেউ হয়তো হারটা নিয়ে অন্য কারোর ব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখতেও পারে! ভন্‌ভন্‌ করে মৃদু গুঞ্জন উঠল দলটার মধ্যে। যদিও মানুষগুলো ফিসফিস করে কথাবার্তা বলছিল তবু, হুপো আর রানী দু'জনেই বুঝতে পারল সবার উদ্বিগ্নতার কারণ। ভয়াতুর দৃষ্টিতে হুপোর দিকে তাকাল রানী। হুপো রানীর কানে কানে বলল, চল রানী, আমরা পেলিয়ে যাই। না'হলে বাবুরা জানতে পারলে মেরে আলু ছ্যাঁচা করবে। রানী চকিতে হুপোর হাত থেকে চিলের মত ছোঁ মেরে মাংসের প্যাকেটটা ছিনিয়ে নিয়ে ভোঁ দৌড় লাগাল। রানীর দৌড় দেখে পিকনিক বাবুদের সন্দেহ হল ওদের ওপর। হাঁড়িমুখো ব্যস্তভাবে বলল, ধর ধর। ছুঁড়িটার পিছনে ধাওয়া কর।

মনে হচ্ছে হারটা ওরাই নিয়েছে। কথাটা শুনে হুপোও দৌড় লাগাল রানীর পিছনে পিছনে। পিকনিক দলের উঠতি বয়সের দু'জন ছেলে ওদের পিছু নিল।

হুপো দূর থেকেই চিৎকার করল, অ্যাই রানী-ই-ই,—ওদিকে যাসনি। চোরা বালিতে সেঁধিয়ে যাবি। রানী তবুও থামে না। উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে মাংসের প্যাকেট হঠাৎই রানীর হাত ফসকে পড়ে গেল নদী চরে। দিন শেষে দু'চারটে শঙ্খচিল তখনও পাক মারছিল আকাশে। প্যাকেটটা দেখতে পেয়ে পাখা গুটিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল একটা চিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানী। হুপোও দৌড়ে এসে দাঁড়াল রানীর পাশে। আকাশ পানে চেয়ে রানী হুপোকে বলল, দেখ দাদা, চিলটা কী ঢ্যামনা। আমাদের মানসোর ঢোপটা ছুঁ মেরে নে' গেল!

পিকনিক দলের উঠতি বয়সের ছেলে দু'টো পাকড়াও করল ওদের।

—অ্যাই, দাঁড়া। পালানোর চেষ্টা করবি না। মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব তাহলে। তোদের সার্চ করব আমরা। তোরাই হারটা নিয়েছিস মনে হচ্ছে।

—না-বাবু-না। আমরা হার নিইনি।

—হার নিসনি তো দৌড়ালি কেন?

—ও দৌড়াল তাই, আমিও। রানীকে দেখিয়ে কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল হুপো। ছেলে দু'টো ওদের সারা দেহ তল্লাশি করে পেল না কিছুই। ওরা দেহ-তল্লাশ করে ফিরে যেতেই রানী ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল ভয়ে। হুপো সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কাঁদিসনে রানী, তুকে বড় হয়ে—আমি এট্টা খু-উ-ব সোন্দর হার দিব, দেখবি।

—তবে যে হাবুলদা বল্লে, মাটিতে পড়া জিনিস যে আগে পাবে তার! রানী আরও জোরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এর মধ্যে হাবলা এসে দাঁড়াল ওদের কাছে। রানীর কান্না দেখে বলল, মানসোর ঢোপ চিলে নিয়েচে বলে কানছিস?···চিল পো'লে কুটোটা নিয়েই উড়ে। কাঁদিসনে রানী। নে, আমার সব মানসো তুই-ই নে। হাবলা ওর মাংসের প্যাকেটটা রানীকে দিতে গেল। রানী ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, ধুস! তুর ই মানসো কে নিবে? ফিরিয়ে দিতে পারবি আমাদেরটা···উর ভেতরে সোনার হার আচে···

—সোনার হার! হাবলা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল রানীর দিকে। সেই মুহূর্তে হুপোদের মাংসের প্যাকেটটা নিয়ে চিলটা পাক মারল আকাশে। চিলটাকে দেখিয়ে হুপো আকাশের দিকে হাত দেখায়, দ্যাখ, দ্যাখ রানী। হুই দ্যাখ!

একটা পাক মেরেই চিলটা সোজা উড়ে গেল গোকুলপুরের দিকে। চিলটাকে চলে যেতে দেখে রানী বলল, মা বলে, শাঁখচিলের ঘটি-বাটি, গোদা-চিলের মুখে লাথি। শাঁখচিল খু-উ-ব ভাল হয়। চ দাদা, আমরাও দৌড় নাগাই চিলটার পিছুতে। যদি ফেলে দেয় তবে কুড়িয়ে নিব ঢোপটা।

হুপো বলল, ঠিক বলেছিস রানী, চ।

আকাশমুখো হুলো আর রানী চোখ দিয়ে আকাশ চাটতে চাটতে রেললাইন পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল গোকুলপুরের দিকে।

ভারতবর্ষ

রাত ন'টা বেজে পাঁচ মিনিট! গাঁয়ের নাইট স্কুলের মাষ্টার বাদলবাবু আনত চোখে ঘড়ি দেখেন। মনে মনে ভাবেন, যতসব হাড়-জ্বালানি কারবার। কাল আবার ১৫ই আগস্ট। সকালে পতাকা তুলতে হবে। না তুললেও অসুবিধা। সরকারি সাহায্য নিয়ে স্কুল চালানো। সামান্য কোনো ত্রুটি পেলেই সাহায্য বন্ধ হবে। তার ওপর যতসব বুড়ো-হাবড়া নিয়ে কারবার। পাক্কা শাল সব এক্কেকটা। ভাবতে ভাবতে হ্যারিকেনের কলটা ঘুরিয়ে দেন,… চোখে কম দেখেন কিনা! তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে বলেন, এই-যে তারাপদ, সুবোল, বিনোদ-খুড়ো, লক্ষ্মীর মা…। কাল সকালে সবাই এখানে উপস্থিত হবে। কাল পতাকা তোলা হবে।

লক্ষ্মীর মা শুধাল, কিসের পতাকা মাষ্টার?

মাষ্টার বলেন, আরে! এও জান না? কাল স্বাধীনতা দিবস যে। সুবোল চোখ পিট পিট করতে করতে বোকাপারা মুখ ক'রে শুধাল, স্বাধীনতা দিবস হলে কী হয় মাষ্টার?

মাষ্টার বললেন, তোমার মাথা হয়!

তারাপদ সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে সুবোলকে বলে, তাউ জান না সুবল ভাগ্না। স্বাধীনতার পর হতেই ত আমাদেগের ভোট দিতে দিইছে। মাথা গুনতি করচে না বার কয়েক? মনে লাই (নাই)? আরে ঐ-যে সেমুসর বাবুরা এয়েছেল না।

মাষ্টার রাগান্বিত ভাবে বলেন, ওসব বকবক ছেড়ে এখন কাজের কথা বলো। তারপর সবার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, তাহলে পতাকা আনার ভার নিচ্ছ কে?

তারাপদ শুধাল, বিনোদখুড়োর বাড়িতে গেল বছরের পতাকা ছেল না?

বিনোদ উত্তর দেয়, সে ত পুকাই (পোকাই) কেইটে দেছে।

লক্ষ্মীর মা শুধোয়, তা'লে কী হবে মাষ্টার?

মাষ্টার বললেন, কি আর হবে। আমাদের গাঁয়ে তো আর বাজার নেই, কাল সকালে বাজারে গেলে ফিরতেই তো বেলা গড়াবে।

বিনোদ খুড়ো বলে, তা'লে আর নোতুন পতাকায় কাজ লাই। কাল সক্কালে ম্যায়াডারে দিয়ি সিলাই কইরে সাইরে সুইরে লিয়ে আসব। মাষ্টার-মশাই গম্ভীর ভাবে কেশো গলা দু'বার খকখক ক'রে পরিষ্কার করেন। তারপর আদেশের সুরে বলেন, তাহলে কাল সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে সবাই চলে

আসবে। মনে থাকবে তো? তারাপদ বলে, কাল সকালে যে আমাদেগেরে মুনিশ খাটতে যেতি হবে মাষ্টার।

মাষ্টার বললেন, একদিন না হয় না-ই খাটলে। স্বাধীনতা দিবস বলে কথা। আনন্দ করার দিন।

সুবোল শুধাল, তা'লে আমরা খাব কি? প্যাট চলবে কী কইরে! সমসারে ত বউ-ছ্যালে-ম্যায়ে আচে?

মাষ্টার কোনো উত্তর খুঁজে পান না। বাব বার ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকান। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, সবাইকে এক তাড়া করে বিড়ি দেবো। যে প্রথমে আসবে তাকে দু'তাড়া দেবো। পরস্পরের মধ্যে ফিসফস কথাবার্তা হয়। একে একে ছালা (বস্তা) গুটিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

বিনোদ খুড়ো সকালে ঠিক সময়েই এসে হাজির হল। আনন্দে আটখানা। পতাকা উঠবে। একে একে বাদলবাবু, তারাপদ, লক্ষ্মীর মা ও সুবোল এসে হাজির হল। গাঁয়ের পাঁচ সাতটা রাখাল ছোঁড়া মজা দেখছে তফাত থেকে।

একটু বাদে বিনোদ খুড়োর ছোট মেয়েটি এক ঝুড়ি ফুল এনে হাজির হল। বিনোদ খুড়ো পতাকার মধ্যে ফুল রেখে দড়ির সঙ্গে ফাঁস গেরোতে পতাকা দিল বেঁধে। বাকি ফুলগুলো পোঁতা বাঁশের বেদীর নিচে ছিটিয়ে দিল।

বাদলবাবু দড়ি টেনে পতাকা তুলছেন। পতাকা যখন বাঁশের মাথায় তখন হ্যাঁচকা টানে ফুলগুলো বর্ষার জলের মত ঝরে পড়তে লাগল। বাদলবাবু বললেন, এবারে জাতীয় সঙ্গীত হবে। 'জনগণ মন অধিনায়ক জ…' জাতীয় সঙ্গীতে বাধা পড়লো। বাদলবাবু চিৎকার করে বললেন, তোমরা সবাই থামো। তারপর বিনোদ খুড়োকে বললেন, করছো কী বিনোদ খুড়ো? পতাকা যে উল্টো বেঁধেছো? সবুজ দিকটা ওপরে থাকবে নাকি?

বিনোদ খুড়ো বোকার মত শুধাল, র‍্যালের সবুজ সেগন্যাল (সিগন্যাল) -ডা ত উপুর দিকেই থাকে মাষ্টার।

মাষ্টার ব্যস্তভাবে বললেন, তর্ক করলে লাভ হবে না। পতাকা নামাও। পতাকা নামাও।

সকলেই তখন পতাকা নামাতে ব্যস্ত।

লক্ষ্মীর মা মাষ্টার মশাইকে উদ্দেশ্য করে শুধাল, আমরা হর টেইম (টাইম) টিপছাপ দিয়ি ত ভোট দিতেছি, তা'লে পতাকা উলটা বাঁধলে দোষ নেচ্ছ ক্যানে মাষ্টার? ততক্ষণে পতাকা নিচে নেমে গেছে।